প্রথম অধ্যায়

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্র, মতাদর্শ ও লেখকগোষ্ঠী

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্র, মতাদর্শ ও লেখকগোষ্ঠী

বর্তমান গবেষণাকর্মটিতে হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের বিষয় ও শৈলী নিয়ে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে এই আন্দোলনত্রয়ের একটি প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হল। অন্যান্য অধ্যায়ের মতো এই অধ্যায়টিকেও তিনটি উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে ত্রিবিধ আন্দোলন আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে প্রতিটি উপ-অধ্যায়ের শুরুতে আন্দোলনের মুখপত্ররূপ পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে ধরে আন্দোলনের ইস্তেহার তথা মতাদর্শগুলি আলোচনা করা হল। এছাড়া আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট লেখকদের তালিকাসহ আন্দোলনের মূল কাণ্ডারীদের প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হল।

১। হাংরি

মুখপত্র : সময়টা ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস। একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল দু'টি বুলেটিন; একটি 'হাংগ্রি জেনারেশন', অন্যটি 'এই দশক'। 'এই দশক'-এর কথায় আসছি পরের উপ-অধ্যায়ে; প্রথমে আসা যাক 'হাংগ্রি জেনারেশন' প্রসঙ্গে। এটি ছিল তিন কলমে ডবলক্রাউন ১/৮ কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা বুলেটিন, বার্জাস টাইপে ছাপা – স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী, নেতৃত্বে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা দেবী রায়। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসের আগেও হাংরিদের বুলেটিন বেরিয়েছে; তবে তা ইংরেজিতে। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে ইংরেজিতে সেই প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশিত হয়েছিল পাটনা থেকে। এবং বাংলা ভাষায় প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশিত হয়েছিল হাওড়া থেকে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে। ক্রমপ্রসারিত এই আন্দোলনের অষ্টম বুলেটিনের (যেটিতে প্রকাশিত হয়েছিল মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি) সমস্ত লেখককে অভিযুক্ত করে কলকাতা পুলিশ ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বুলেটিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় 'obscene' এবং

'unauthorised' বলে।[১] সেই বৃত্তান্ত উত্তম দাশ তাঁর 'হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নথিপত্রসহ। প্রথম পর্বের হাংরি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এখানেই। এরপর দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলন শুরু হয়েছিল বেশ কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। হাংরি আন্দোলনের ভাঙাগড়ার এই ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি মলয় রায়চৌধুরীর 'হাংরি কিংবদন্তি', শৈলেশ্বর ঘোষের 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন', দেবী রায়ের 'হাংরি গদ্য' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে; তাঁদের নিজস্ব ভাষ্যে। এছাড়া হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করেছেন পূর্ববর্তী দু'জন গবেষক, যা বর্তমান অভিসন্দর্ভের 'ভূমিকা' অংশে ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষকের মূল অন্বিষ্ট যেহেতু শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে আলোচ্য আন্দোলনত্রয়ের প্রকৃত ভূমিকা বিচার করা, তাই হাংরি আন্দোলনের বিতর্কিত ইতিহাসের চর্বিতচর্বণ না করে, এই অধ্যায়ে সেই ইতিহাসের একটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছ একটি রূপরেখা তুলে ধরা হল।

দ্বিতীয় দফার হাংরি আন্দোলন যে পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কয়েকটি হল 'ক্ষুধার্ত', 'জেব্রা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'স্বকাল' ইত্যাদি। শৈলেশ্বর ঘোষ দ্বিতীয় দফায় হাংরি আন্দোলন জারি রেখেছিলেন মুখপত্ররূপ পত্রিকা 'ক্ষুধার্ত'কে কেন্দ্র করে, যার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৯-এ, এবং শেষ সংখ্যাটি ১৯৮৪তে। মোট সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল সাতটি। সংখ্যাগুলির একটি তালিকা তুলে ধরা হল –

১। **'ক্ষুধার্ত'** প্রথম সংকলন, ১৩৭৬ সম্পাদক বাসুদেব দাশগুপ্ত

২। **'ক্ষুধার্ত'** দ্বিতীয় সংকলন, ১৯৭২-১৯৭৩ সম্পাদক সুভাষ ঘোষ

৩। **'ক্ষুধার্ত'** তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫ সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী

৪। **'ক্ষুধার্ত'** চতুর্থ সংকলন, মার্চ ১৯৭৭ সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষ

৫। **'ক্ষুধার্ত'** পঞ্চম সংকলন, মে ১৯৭৮ সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষ

৬। **'ক্ষুধার্ত'** ষষ্ঠ সংকলন, নভেম্বর ১৯৮১ সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষ

৭। **'ক্ষুধার্ত'** সপ্তম সংকলন, মে ১৯৮৪ সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষ

'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার সাতটি সংকলনের প্রচ্ছদ এখানে তুলে ধরা যাক –

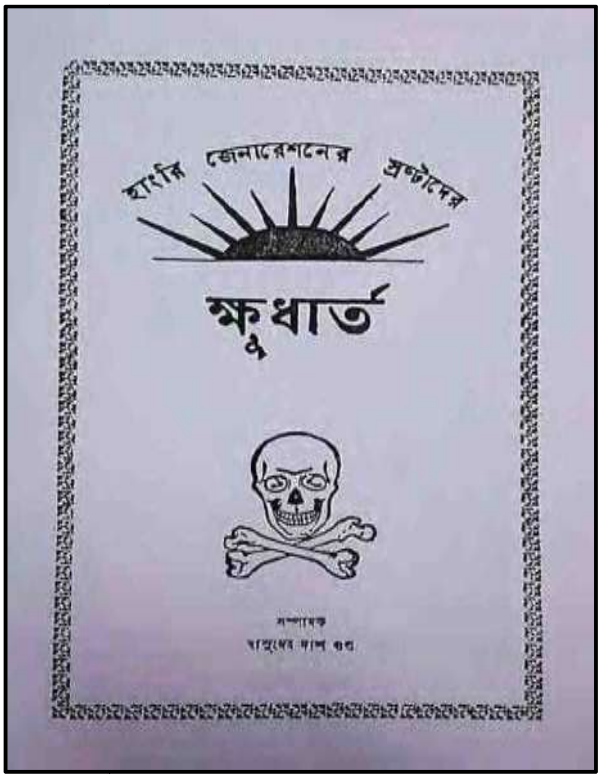

‘ক্ষুধার্ত’ প্রথম সংকলন **১৩৭৬**

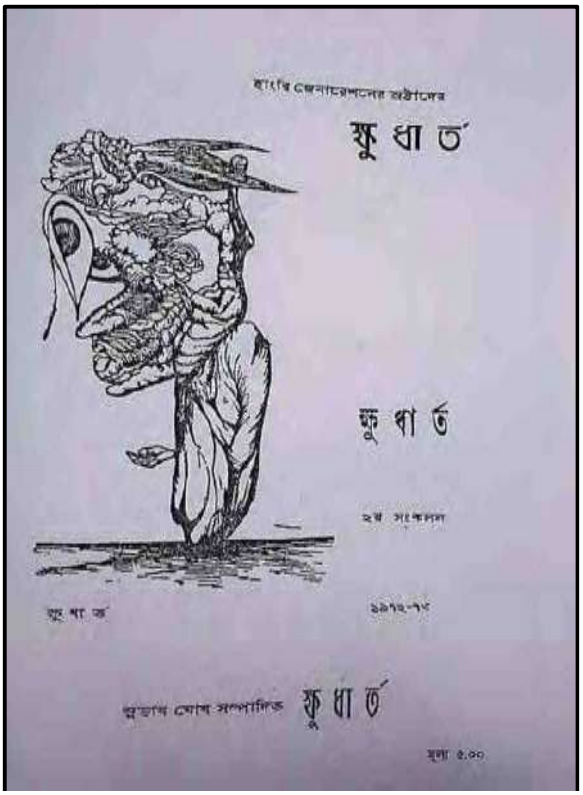

‘ক্ষুধার্ত’ দ্বিতীয় সংকলন **১৯৭২-১৯৭৩**

‘ক্ষুধার্ত’ তৃতীয় সংকলন **১৯৭৫**

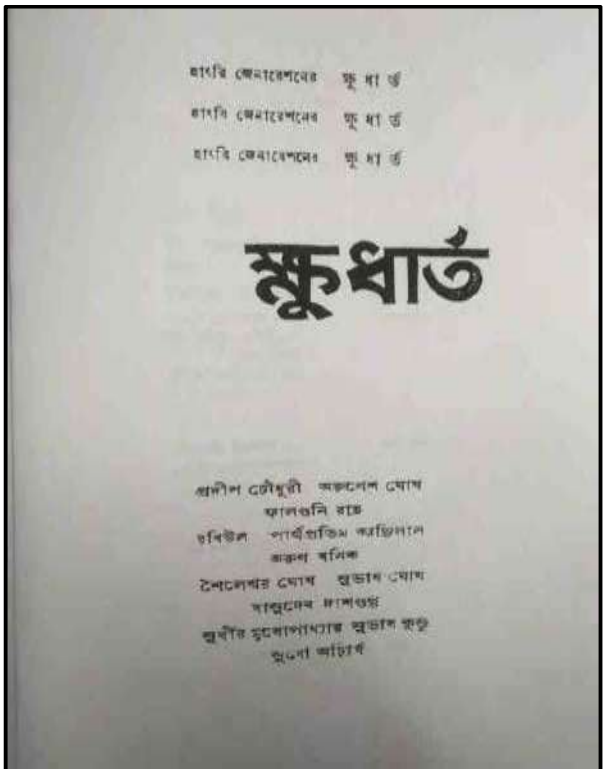

‘ক্ষুধার্ত’ চতুর্থ সংকলন মার্চ **১৯৭৭**

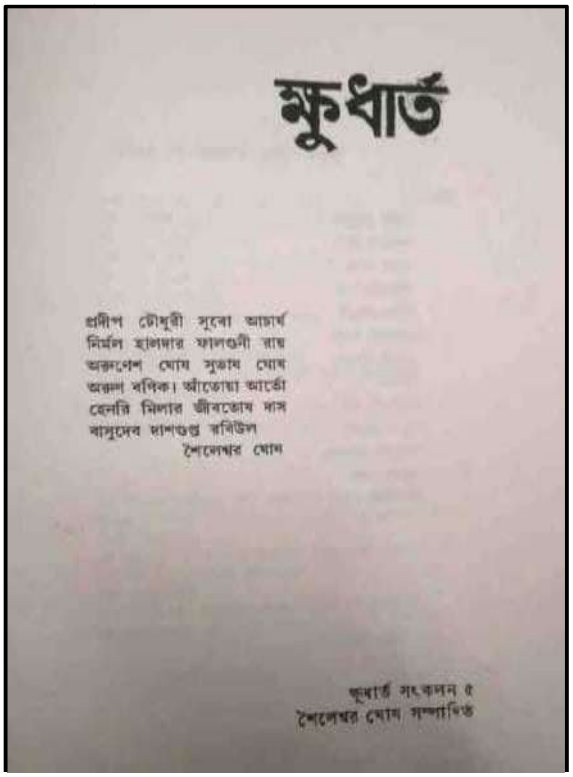

'ক্ষুধার্ত' পঞ্চম সংকলন মে ১৯৭৮

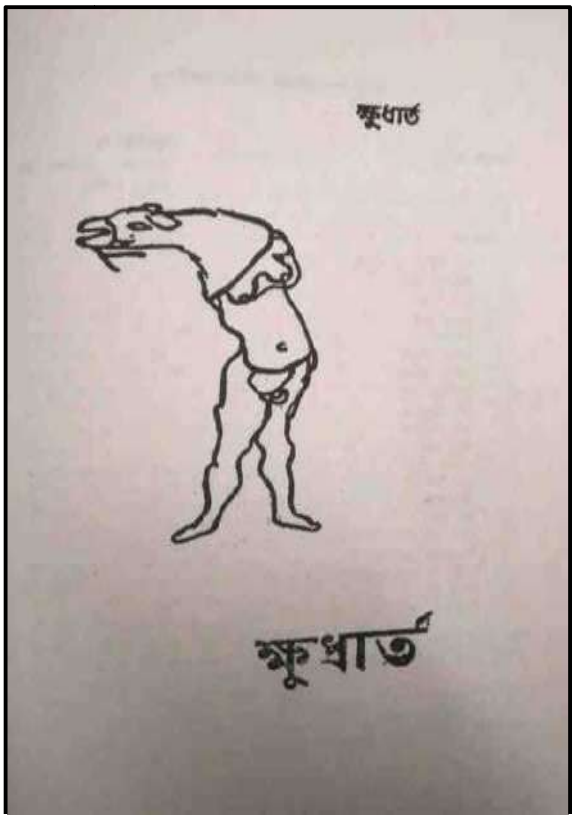

'ক্ষুধার্ত' ষষ্ঠ সংকলন নভেম্বর ১৯৮১

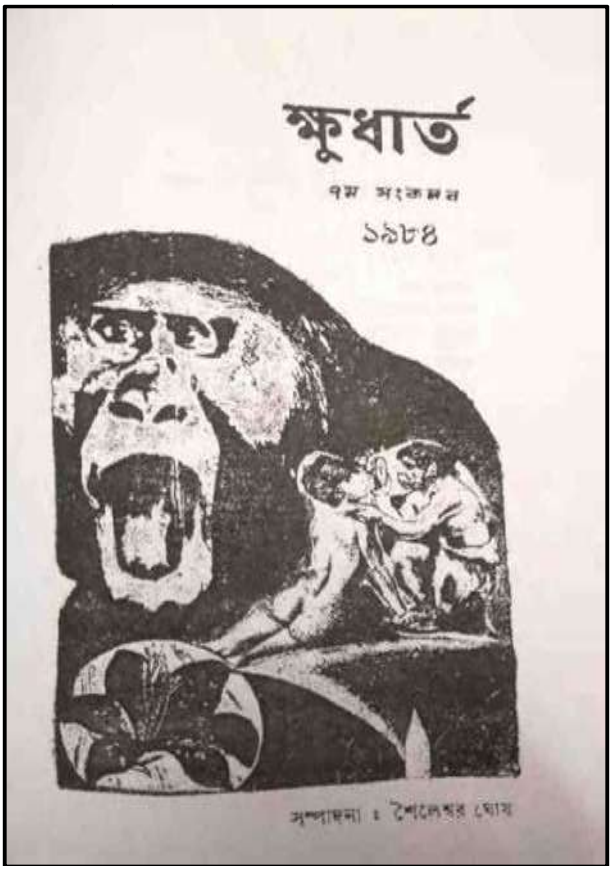

'ক্ষুধার্ত' সপ্তম সংকলন মে ১৯৮৪

সাধারণ পাঠক শৈলেশ্বর ঘোষের এই 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকা কেন্দ্রিক দ্বিতীয় দফার হাংরি আন্দোলনকেই একমাত্র হাংরি আন্দোলন হিসেবে চেনে। বাজারে যে 'ক্ষুধার্ত সংকলন' পাওয়া যায়, সাধারণ পাঠক তা'ই পড়ে। কিন্তু এটিই একমাত্র হাংরি আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনের দ্বিতীয় দফায় মলয় রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় 'জেব্রা'র দু'টি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল –

১। জেব্রা-১, ১৯৬৬ সম্পাদক মলয় রায়চৌধুরী

২। জেব্রা-২, ১৯৬৭ সম্পাদক মলয় রায়চৌধুরী

আনন্দের খবর যে, সম্প্রতি মলয় রায়চৌধুরীর 'জেব্রা'র অখণ্ড সংকলন গ্রন্থাকারে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও এই আন্দোলনের দ্বিতীয় দফায় সুবিমল বসাকের 'প্রতিদ্বন্দ্বী', প্রদীপ চৌধুরীর 'স্বকাল' ও 'ফুঃ', সুভাষ ঘোষের 'ক্ষুধার্ত খবর', অরুণেশ ঘোষের 'জিরাফ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মলয় রায়চৌধুরীর 'জেব্রা' সংকলনদ্বয়ের প্রচ্ছদ এখানে তুলে ধরা হল -

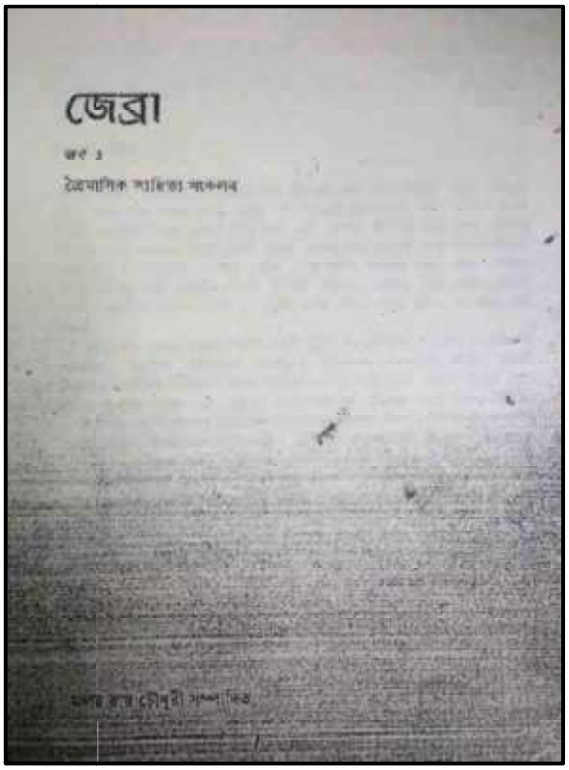

জেব্রা-১, ১৯৬৬

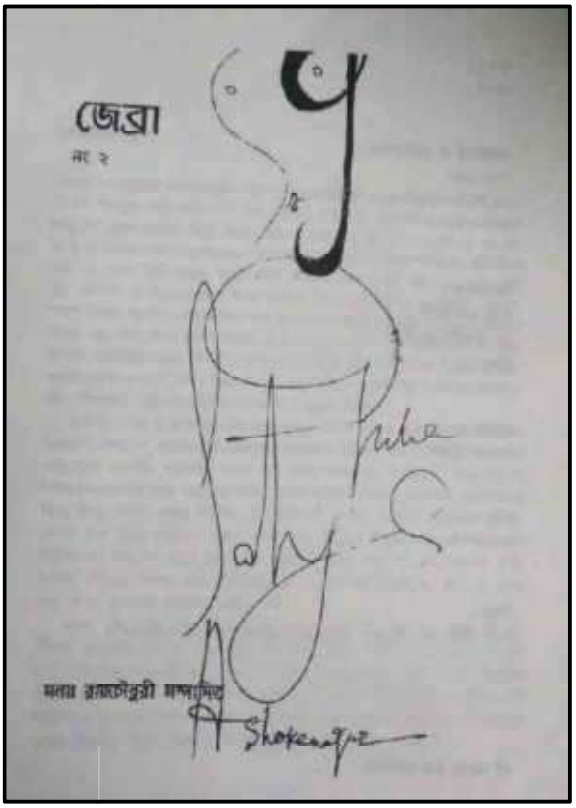

জেব্রা-২, ১৯৬৭

মতাদর্শ : মূল হাংরি আন্দোলনের মতাদর্শগত অবস্থানটিকে চিনে নেওয়া যেতে পারে এই আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরীর নিম্নলিখিত ইস্তেহারটি[২] থেকে –

1. The merciless exposure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before it.
3. To catch a glimpse of the exploded self at a particular moment.
4. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
5. To consider everything at the art to be nothing but a 'thing' with a view to tesing whether it is living or lifeless.
6. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
7. To seek to find out a mode of communication, by abolishing the accepted modes of prose and poetry which would instantly establish a communication between the poet and his reader.
8. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
9. To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation, more sharply in the poem.
10. To break loose the traditional association of words and coin unconventional and here-to-force unaccepted combination of words.
11. To reject traditional forms of poetry and allow poetry to take its original forms.
12. To admit without qualification that poetry is the ultimate religion of man.

13. To transmit dynamically the massage of the restless existence and the sense of disgust in a razor sharp language.
14. Personal ultimatum.

সূত্রগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে বলা হয়েছে সামগ্রিক আত্মোন্মোচনের কথা। হাংরিদের লেখালেখিতে নিজের মূল খোঁজার প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে দেখা যায় এবং তাঁরা মনে করতেন এই খোঁজাই একমাত্র আধুনিকতা যা চিরকালীন। একজন অন্যতম প্রধান হাংরি লেখক শৈলেশ্বর ঘোষের ভাষায়, "কোন রকম আধুনিকতাকে আমি স্বীকার করি না। আমার কাছে সারা পৃথিবীময় সমস্ত সৃষ্টিকাজ একই সুরে বাঁধা, আত্মার বন্দিত্ব ও তার মুক্তির প্রচেষ্টা তার ক্রন্দন, হতাশার গর্জন ও অভিশাপ থেকে আনন্দে যাবার এটাই একমাত্র আধুনিকতা চিরকালের – এছাড়া মানুষের অন্য কোন ইতিহাস নাই।"[৩] তিনি আরও বলেছেন, "হাংরিরা মানুষের টোটাল ফর্মটাই ভেঙে ফেলতে চায় কারণ এই ফর্মে মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারবে না। আমরা আমাদের অস্তিত্বের আসল অর্থটাই জানি না। জানতে দেয়া হয় না। জন্মগ্রহণ ব্যর্থ হয়ে যায় যদি জানতে না পারি আমি কে এবং এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু কণা, প্রতিটি প্রাণের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারি। মহাশূন্যের জন্মগর্ভ অন্ধকারের সঙ্গে যদি পরিচয় না হয় তবে অন্তরের আলো জ্বলবে কী করে? অন্ধকার আগে, আলো পরে। অন্ধকারের বিপরীত অবস্থা আলো নয়। আলো অন্ধকারের সন্তান। আমাদের জন্মের আগেই বস্তুসমূহ ষড়যন্ত্রময় অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। ক্ষমতার প্রভাবে এই ঘটনা ঘটে। তাই বস্তুসমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই ক্ষুধার্তদের উদ্দিষ্ট পথ।"[৪]

মলয় রায়চৌধুরী কথিত সূত্রগুলির মধ্যে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'ordinary conversation' অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ভাষা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। তথাকথিত সাহিত্যিক ভাষাপদ্ধতি তাঁরা কেউই অনুসরণ করেননি। হাংরি আন্দোলনের প্রথম বুলেটিনে মলয় রায়চৌধুরী বলেছিলেন,

> ছন্দে গদ্য লেখার খেলাকে কবিতা নাম দিয়ে চালাবার খেলা এবার শেষ হওয়া প্রয়োজন। টেবলল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সেরিব্রাল কর্টেক্সে কলম ডুবিয়ে কবিতা বানাবার কাল শেষ হয়ে গেছে।... শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত। শখ করে ভেবে ভেবে, ছন্দে গদ্য লেখা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কবিতা রচনা তেমন করে কোনো দিনই সম্ভব নয়।[৫]

ভাষা প্রসঙ্গে শৈলেশ্বর ঘোষও বলেছিলেন,

> এক একটি ভয়াবহ বিপ্লবের ফল হিসাবে দেখা দেয় এক একটি নতুন ভাষা। শব্দের আদিম জৈবতা নষ্ট করে তাকে বাজারি বেশ্যায় পরিণত করা হয়েছে। আজ এ কাজে সবচেয়ে অগ্রণী মধ্যবিত্ত ভাঁড়ের দল যারা যে কোন প্রকৃত সৃষ্টির উপর তাদের কলঙ্কিত বীর্য নিক্ষেপ করে তাকে ধংস করতে চায়, শব্দ তারা ব্যবহার করে চলেছে তাদের কাম লালসাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য, ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দেবার জন্য – এ অবস্থা থেকে শব্দকে মুক্তি দিতে হলে, রক্ষা করতে হলে, কেবল ওই শব্দকে আক্রমণ করলেই নয়, ঐ শব্দকে আক্রমণ করার অর্থ তো ঐ শব্দ যাদের রক্ষিতা তাদেরই আক্রমণ করা যা কিনা আজকের প্রচলিত সমস্ত মূল্যবোধ।
>
> এক এক সময়ের ভাষা এক এক সময়ের মূল্যবোধকে ধারণ করে থাকে, সেই সময় পার হয়ে গেলে পরের জেনারেশনের কাছে ভাষা, শব্দ তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। ভাষাকে তখনই আক্রমণ করতে হয়। তার শক্তিকে পুনরুদ্ধার করার জন্যই। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় যা আরো তাৎপর্যময়, ভাষাকে আক্রমণ করলে ভাষাও হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক। সে ভাষা তখনই আক্রমণ করতে ছুটে যায়, কারণ তার শক্তিকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।[৬]

কোনো রকমের শব্দসংস্কার মানেননি হাংরি লেখকরা। মলয় রায়চৌধুরী স্পষ্টই বলেছিলেন যে, তিনি শব্দের কোনো রকম শ্রেণি-বিভাজনে বিশ্বাসী নন। কোনো শব্দকেই এমনকী কোনো 'স্ল্যাং'কেও আলাদা করে সরিয়ে রাখবেন না তিনি, এবং অন্য কাউকেও তা করতে দেবেন না -

> I will not allow any class distinction of words and expresssions, I will not allow any one to renounce, adjure, penalize or discard even a single word, expression, slang, sentence or phrase ...[৭]

হাংরি সাহিত্যকে তাই শালীনতার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারংবার। হাংরি লেখকরা মনে করতেন, মানুষের অস্তিত্বের স্বাধীনতার অন্যতম শর্তই হল যৌনতার মুক্তি।[৮] তাই বিশ শতকের ষাটের দশকে ভণ্ডামির নামাবলিটা সরিয়ে মানুষের সার্বিক যৌনশক্তিকে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছিল। ভিক্টোরিয় নীতিবোধের অবদমন থেকে যৌনতাকে মুক্ত করেছিল হাংরিরাই।

হাংরি আন্দোলনের অভিমুখটিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের মুখপত্ররূপ পত্রিকা 'ক্ষুধার্ত'-এর প্রথম সংকলনে বাসুদেব দাশগুপ্তের লেখা সম্পাদকীয় থেকেও,

> আমরা শিল্পী সাহিত্যিক নই হাজার হাজার বছরের গু গোবর টানতে রাজি নই আমরা আমাদের কোনো প্রতিভা নাই প্রতিভাবানদের মতো পারিবারিক তাঁবেদারিতে আমরা অপারগ বাংলা সাহিত্যের অংশ বা পরিশিষ্ট আমরা নই যেকোনো ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা সীমাহীন আমরা দুষ্ট নই শিষ্টও নই পুরস্কার দিই না নিই না আসলে

> আমরা কিছুই চাই না ধুতি পাঞ্জাবী পরে সভাপতি হবার যোগ্য আমরা কখনও হব না কাউকে প্রভাবিত করা পরিচালিত করার মতো ভণ্ডামিতে বিশ্বাস করি না অন্যের মুক্তির কথা বলি না অন্যের মুক্তির উপায় আমরা জানি না আমাদের হাতে অমরত্বের নিশান নাই আমাদের শ্লীলতা নাই অশ্লীলতাও নাই আমরা মুখ এবং পোঁদ দু'দিক দিয়ে কথা বলি না অভিজ্ঞতা ভিন্ন কোনো সত্য আছে বলে মনে করি না।
>
> ক্ষুধার্ত গোষ্ঠী বা সমাজ নয় ক্ষুধার্ত বাসুদেব দাশগুপ্তের নয় ক্ষুধার্ত কাউকে সুবাতাস দেবে না সমুজ্জ্বল স্বস্তি দেবে না সত্য ও সততা যাদের কাছে এক ক্ষুধার্ত তাদের ক্ষুধার্ত ক্ষুধার্তের।[৯]

এই সম্পাদকীয় লেখাটির লিখনশৈলী আমাদের পরিচিত নয়। দু'টি অনুচ্ছেদে লেখা এবং কেবলমাত্র অনুচ্ছেদের শেষে ছাড়া বাক্যের শেষে পূর্ণবিরতি চিহ্ন নেই। এছাড়াও এমনকিছু তথাকথিত 'অশ্লীল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আমাদের ভিক্টোরিয়ান রুচিবোধকে আঘাত করে। হাংরি সাহিত্য মাত্রই পাঠকের চেতনাকে আঘাত করে সর্বদা; এই সাহিত্য ঠিক সুখপাঠ্য নয়। এই সাহিত্য যে উপভোগ করা যায় না, তা হাংরি লেখক শৈলেশ্বর ঘোষের বক্তব্যে স্পষ্ট,

> শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সবদেশেরই মানুষের চেতনা অঞ্চল সম্প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু এটা ছিল আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য। হাংরি রচনা উপভোগ করা যায় না। এর উপযোগিতা মূল্য শূন্য। হাংরি কবি লেখকরা কোনো দর্শনের উপর ভিত্তি করে লেখে না, নিজের জীবন মন্থন করে, অভিজ্ঞতার কাঁচা মালই তাদের লেখা।[১০]

সুতরাং, হাংরিদের ইস্তেহার তথা মতাদর্শগুলি থেকে বোঝা গেল যে, তাঁরা আসলে ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে সমস্তরকমের প্রাতিষ্ঠানিকতা (Establishment) ও গতানুগতিক প্রথার (Conventions) ধ্বজা ভেঙে সমস্ত রকম ছুঁৎমার্গিতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে এক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। 'শিল্পের জন্য শিল্প' – এমন ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা থেকে তাঁরা সরে এসে নিজেদের উত্তর-ঔপনিবেশিক অবস্থানটিকে স্পষ্ট করেছিলেন। উল্লেখ্য, কেবলমাত্র সাহিত্য-জগতেই নয়, হাংরিরা সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্পকর্ম, ধর্ম, রাজনীত ইত্যাদি বিষয়ক পৃথক পৃথক ইস্তেহার প্রকাশ করে একটি সার্বিক আন্দোলনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর সেজন্যই তাঁদের ওপর আক্রমণও হয়েছিল প্রবল। কেবলই সাহিত্য-আন্দোলন হলে, হাংরিদের নিয়ে সেই সময়ে এত হইচই, এত মাথাব্যাথা, অবদমনের এত প্রবল প্রচেষ্টা – এসব হতো বলে মনে হয় না। তাঁদের কয়েকটি বিবিধ বিষয়ক ইস্তেহারের ছবি এখানে তুলে ধরা হল –

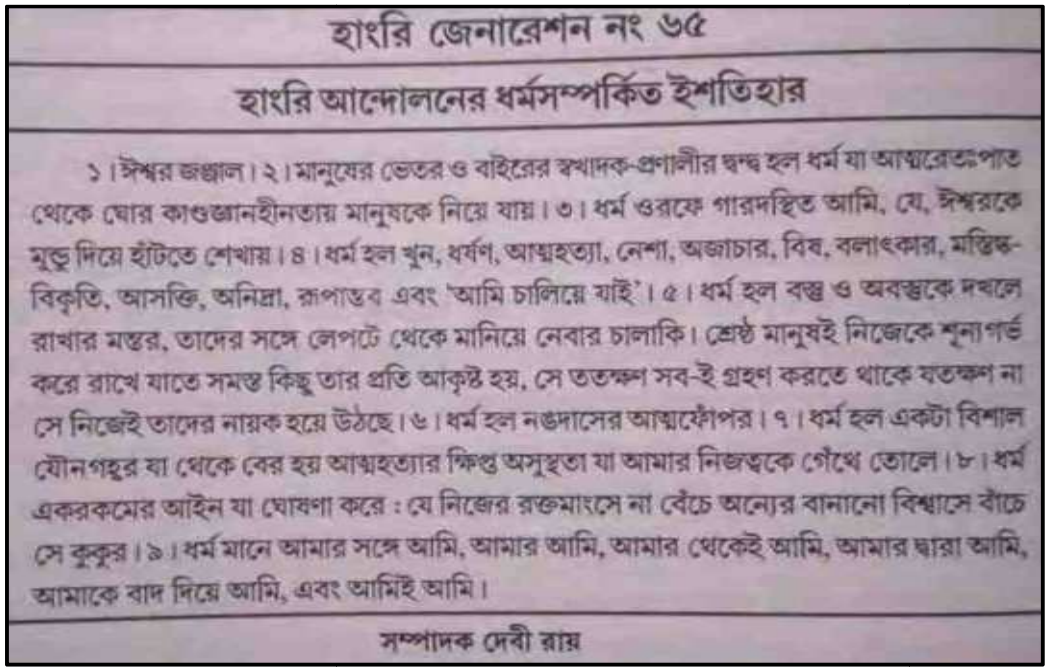

হাংরি জেনারেশন নং ৬৫

হাংরি আন্দোলনের ধর্মসম্পর্কিত ইশতিহার

১। ঈশ্বর জঞ্জাল। ২। মানুষের ভেতর ও বাইরের স্বথাদক-প্রণালীর দ্বন্দ্ব হল ধর্ম যা আত্মরেতঃপাত থেকে ঘোর কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় মানুষকে নিয়ে যায়। ৩। ধর্ম ওরফে গারদস্থিত আমি, যে, ঈশ্বরকে মুড়ু দিয়ে হাঁটতে শেখায়। ৪। ধর্ম হল খুন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, নেশা, অজাচার, বিষ, বলাৎকার, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, আসক্তি, অনিদ্রা, রূপান্তর এবং 'আমি চালিয়ে যাই'। ৫। ধর্ম হল বস্তু ও অবস্তুকে দখলে রাখার মন্তর, তাদের সঙ্গে লেপটে থেকে মানিয়ে নেবার চালাকি। শ্রেষ্ঠ মানুষই নিজেকে শূন্যগর্ভ করে রাখে যাতে সমস্ত কিছু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে ততক্ষণ সব-ই গ্রহণ করতে থাকে যতক্ষণ না সে নিজেই তাদের নায়ক হয়ে উঠছে। ৬। ধর্ম হল নঙদাসের আত্মফোঁপর। ৭। ধর্ম হল একটা বিশাল যৌনগহ্বর যা থেকে বের হয় আত্মহত্যার ক্ষিপ্ত অসুস্থতা যা আমার নিজত্বকে গেঁথে তোলে। ৮। ধর্ম একরকমের আইন যা ঘোষণা করে : যে নিজের রক্তমাংসে না বেঁচে অন্যের বানানো বিশ্বাসে বাঁচে সে কুকুর। ৯। ধর্ম মানে আমার সঙ্গে আমি, আমার আমি, আমার থেকেই আমি, আমার দ্বারা আমি, আমাকে বাদ দিয়ে আমি, এবং আমিই আমি।

সম্পাদক দেবী রায়

হাংরি আন্দোলনের ধর্ম বিষয়ক ইস্তেহার

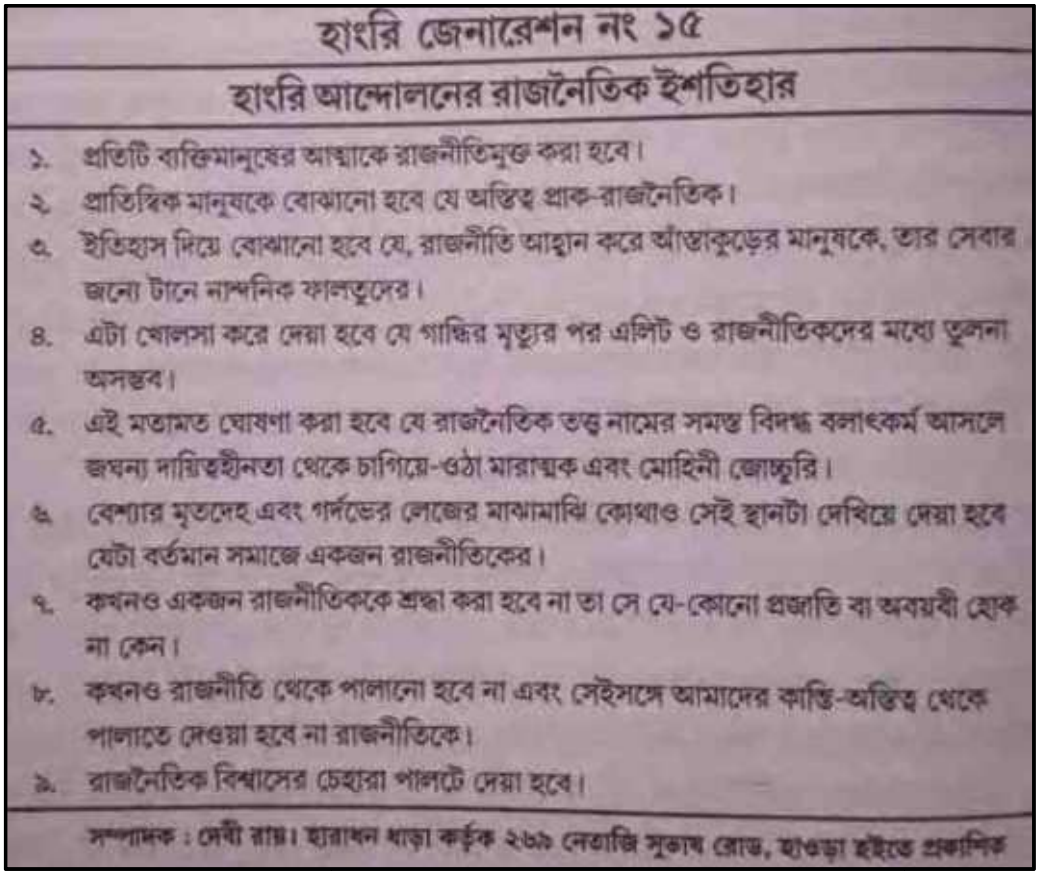

হাংরি জেনারেশন নং ১৫

হাংরি আন্দোলনের রাজনৈতিক ইশতিহার

১. প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের আত্মাকে রাজনীতিমুক্ত করা হবে।
২. প্রাতিস্বিক মানুষকে বোঝানো হবে যে অস্তিত্ব প্রাক-রাজনৈতিক।
৩. ইতিহাস দিয়ে বোঝানো হবে যে, রাজনীতি আহ্বান করে আঁস্তাকুড়ের মানুষকে, তার সেবার জন্যে টানে নান্দনিক ফালতুদের।
৪. এটা খোলসা করে দেয়া হবে যে গান্ধির মৃত্যুর পর এলিট ও রাজনীতিকদের মধ্যে তুলনা অসম্ভব।
৫. এই মতামত ঘোষণা করা হবে যে রাজনৈতিক তত্ত্ব নামের সমস্ত বিদগ্ধ বলাৎকর্ম আসলে জঘন্য দায়িত্বহীনতা থেকে চাগিয়ে-ওঠা মারাত্মক এবং মোহিনী জোচ্চুরি।
৬. বেশ্যার মৃতদেহ এবং গর্দভের লেজের মাঝামাঝি কোথাও সেই স্থানটা দেখিয়ে দেয়া হবে যেটা বর্তমান সমাজে একজন রাজনীতিকের।
৭. কখনও একজন রাজনীতিককে শ্রদ্ধা করা হবে না তা সে যে-কোনো প্রজাতি বা অবয়বী হোক না কেন।
৮. কখনও রাজনীতি থেকে পালানো হবে না এবং সেইসঙ্গে আমাদের ক্লান্তি-অস্তিত্ব থেকে পালাতে দেওয়া হবে না রাজনীতিকে।
৯. রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেহারা পালটে দেয়া হবে।

সম্পাদক : দেবী রায়। হারাধন ধাড়া কর্তৃক ২৬৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত

হাংরি আন্দোলনের রাজনীতি বিষয়ক ইস্তেহার

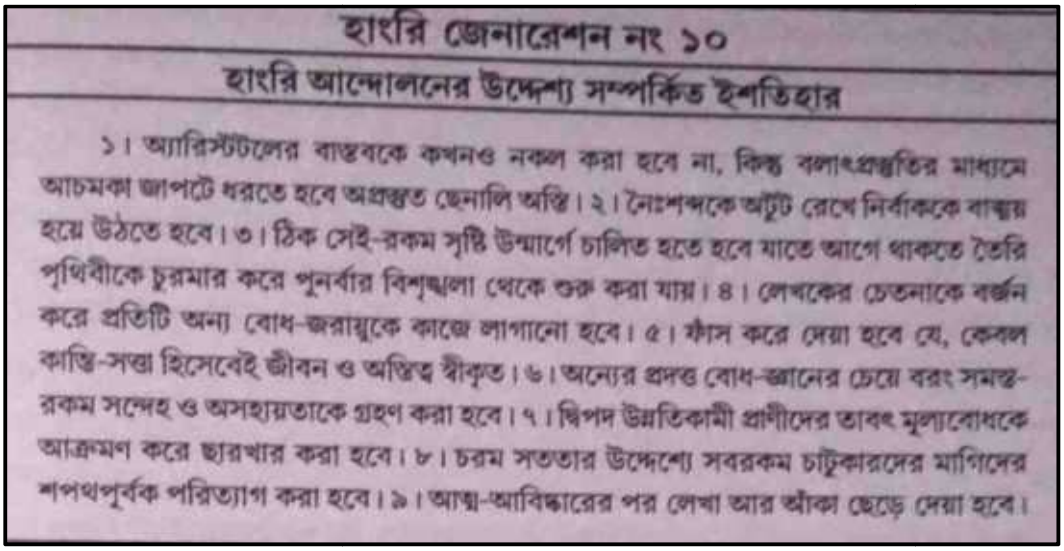

হাংরি জেনারেশন নং ১০

হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইশতিহার

১। অ্যারিস্টটলের বাস্তবকে কখনও নকল করা হবে না, কিন্তু বলাৎপ্রস্তুতির মাধ্যমে আচমকা জাপটে ধরতে হবে অপ্রস্তুত ভেনালি অস্তি। ২। নৈঃশব্দকে অটুট রেখে নির্বাককে বাঙ্ময় হয়ে উঠতে হবে। ৩। ঠিক সেই-রকম সৃষ্টি উন্মার্গে চালিত হতে হবে যাতে আগে থাকতে তৈরি পৃথিবীকে চুরমার করে পুনর্বার বিশৃঙ্খলা থেকে শুরু করা যায়। ৪। লেখকের চেতনাকে বর্জন করে প্রতিটি অন্য বোধ-জরায়ুকে কাজে লাগানো হবে। ৫। ফাঁস করে দেয়া হবে যে, কেবল কান্তি-সত্তা হিসেবেই জীবন ও অস্তিত্ব স্বীকৃত। ৬। অন্যের প্রদত্ত বোধ-জ্ঞানের চেয়ে বরং সমস্ত-রকম সন্দেহ ও অসহায়তাকে গ্রহণ করা হবে। ৭। দ্বিপদ উন্নতিকামী প্রাণীদের তাবৎ মূল্যবোধকে আক্রমণ করে ছারখার করা হবে। ৮। চরম সততার উদ্দেশ্যে সবরকম চাটুকারদের মাগিদের শপথপূর্বক পরিত্যাগ করা হবে। ৯। আত্ম-আবিষ্কারের পর লেখা আর আঁকা ছেড়ে দেয়া হবে।

হাংরি আন্দোলনের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ইস্তেহার

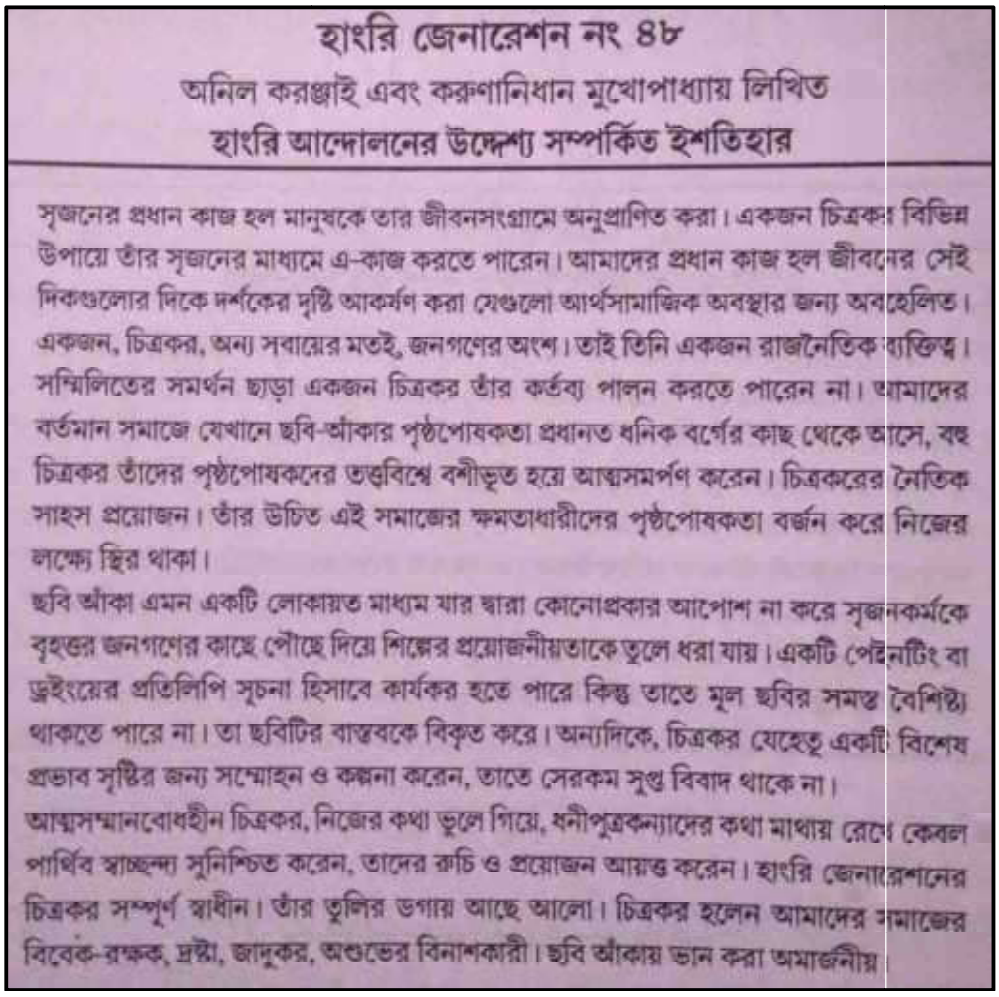

হাংরি জেনারেশন নং ৪৮

অনিল করঞ্জাই এবং করুণানিধান মুখোপাধ্যায় লিখিত
হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইশতিহার

সৃজনের প্রধান কাজ হল মানুষকে তার জীবনসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করা। একজন চিত্রকর বিভিন্ন উপায়ে তাঁর সৃজনের মাধ্যমে এ-কাজ করতে পারেন। আমাদের প্রধান কাজ হল জীবনের সেই দিকগুলোর দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেগুলো আর্থসামাজিক অবস্থার জন্য অবহেলিত। একজন, চিত্রকর, অন্য সবায়ের মতই, জনগণের অংশ। তাই তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সম্মিলিতের সমর্থন ছাড়া একজন চিত্রকর তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারেন না। আমাদের বর্তমান সমাজে যেখানে ছবি-আঁকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রধানত ধনিক বর্গের কাছ থেকে আসে, বহু চিত্রকর তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের তত্ত্ববিশ্বে বশীভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। চিত্রকরের নৈতিক সাহস প্রয়োজন। তাঁর উচিত এই সমাজের ক্ষমতাধারীদের পৃষ্ঠপোষকতা বর্জন করে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকা।

ছবি আঁকা এমন একটি লোকায়ত মাধ্যম যার দ্বারা কোনোপ্রকার আপোশ না করে সৃজনকর্মকে বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়ে শিল্পের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা যায়। একটি পেইন্টিং বা ড্রইংয়ের প্রতিলিপি সূচনা হিসাবে কার্যকর হতে পারে কিন্তু তাতে মূল ছবির সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। তা ছবিটির বাস্তবকে বিকৃত করে। অন্যদিকে, চিত্রকর যেহেতু একটি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টির জন্য সম্মোহন ও কল্পনা করেন, তাতে সেরকম সুপ্ত বিবাদ থাকে না।

আত্মসম্মানবোধহীন চিত্রকর, নিজের কথা ভুলে গিয়ে, ধনীপুত্রকন্যাদের কথা মাথায় রেখে কেবল পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করেন, তাদের রুচি ও প্রয়োজন আয়ত্ত করেন। হাংরি জেনারেশনের চিত্রকর সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর তুলির ডগায় আছে আলো। চিত্রকর হলেন আমাদের সমাজের বিবেক-রক্ষক, দ্রষ্টা, জাদুকর, অশুভের বিনাশকারী। ছবি আঁকায় ভান করা অমার্জনীয়।

হাংরি আন্দোলনের চিত্রকলা বিষয়ক ইস্তেহার

লেখকগোষ্ঠী : হাংরি আন্দোলনের জন্মলগ্নে এই আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন দেবী রায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া মলয় রায়চৌধুরীর দাদা সমীর রায়চৌধুরী তো ছিলেনই। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন প্রদীপ চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুবো আচার্য, ফাল্গুনী রায় প্রমুখ। গদ্যকারদের মধ্যে উল্লেখ্য বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুবিমল বসাক প্রমুখ। দ্বিতীয় পর্বে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় যেসব হাংরি কবিদের আমরা পেয়েছি, তাঁরা হলেন –

১। শৈলেশ্বর ঘোষ
২। প্রদীপ চৌধুরী
৩। সুবো আচার্য
৪। ফাল্গুনী রায়
৫। দেবী রায়
৬। অরুণেশ ঘোষ
৭। জামালউদ্দিন
৮। অরণি বসু
৯। শঙ্খপল্লব আদিত্য
১০। তুষার চৌধুরী
১১। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
১২। নির্মল হালদার
১৩। জীবতোষ দাস
১৪। স্বপন চক্রবর্তী
১৫। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬। সুবীর মুখোপাধ্যায়
১৭। সমীরণ ঘোষ
১৮। রবিউল
১৯। সেলিম মুস্তাফা
২০। রাজা সরকার

হাংরি গদ্য লিখেছেন যারা, তাঁরা হলেন –

১। অবনী ধর

২। সুভাষ কুণ্ডু
৩। সুভাষ ঘোষ
৪। বাসুদেব দাশগুপ্ত
৫। সুবিমল বসাক
৬। রবিউল
৭। আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। শৈলেশ্বর ঘোষ
৯। সুবীর মুখোপাধ্যায়
১০। বিজন রায়

'ক্ষুধার্তে'র সাতটি সংখ্যায় যাঁদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গদ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা হলেন –

১। অমিতাভ দাশগুপ্ত
২। মোহিত চট্টোপাধ্যায়
৩। শৈলেশ্বর ঘোষ
৪। সুভাষ কুণ্ডু
৫। দেবেশ রায়
৬। শঙ্খ ঘোষ
৭। প্রদীপ চৌধুরী
৮। অরুণেশ ঘোষ
৯। নিত্য মালাকার
১০। মলয় রায়চৌধুরী

এছাড়া 'ক্ষুধার্তে'র কিছু সংকলনে কয়েকজনের সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন –

১। উইলিয়াম বারোজের সাক্ষাৎকার (তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫)
২। অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অরুণেশ ঘোষ (তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫)
৩। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুভাষ ঘোষ (তৃতীয় সংকলন, ১৯৭৫)
৪। শঙ্খ ঘোষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অরুণেশ ঘোষ (ষষ্ঠ সংকলন, নভেম্বর ১৯৮১)

হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে এই আন্দোলন সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনার ইতি টানা যাক। মলয় রায়চৌধুরীর জন্ম সাবর্ণ

রায়চৌধুরীর বংশে পাটনায় ১৯৩৯ সালে। তাঁর শৈশব কাটে পাটনার ইমলিতলা পাড়ায় একান্নবর্তী পরিবারে। এই পাড়াটি ছিল দলিত অতিদরিদ্র পরিবার ও লখনৌ নবাবের হারেমের গরিব শিয়া বংশধর অধ্যুষিত। মলয়ের দাদা সমীর রায়চৌধুরী (১৯৩৩-২০১৬) প্রথমে কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন এবং পরে মলয়ের সঙ্গে হাংরি আন্দোলন শুরু করেন; অবসরের পরে তিনি কলকাতায় এসে 'হাওয়া-৪৯' পত্রিকা প্রকাশ করেন। দাদা সমীর রায়চৌধুরীর মাধ্যমেই মলয়ের আলাপ হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর তরুণ মলয়কে সেই সময় ব্রিটিশ কবি জিওফ্রে চসারের 'In the sowre hungry tyme' পঙ্‌ক্তিটি ঘিরে ধরে। আর অসওয়াল্ড স্পেংলারের 'The Decline of the West' গ্রন্থে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বিষয়ক ধারণায় তিনি খুঁজে পেলেন 'হাংরি' শব্দের দার্শনিক ভিত্তি। এই সময় মলয় দাদা সমীরের সঙ্গে আলোচনা করেন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরম্ভ করার সম্ভাবনা নিয়ে। তখনই কলকাতার একটি পত্রিকার দপ্তরে হারাধন ধাড়া নামে এক তরুণ লেখকের সঙ্গে মলয়ের পরিচয় হয়। মলয় হারাধন ধাড়ার হাওড়ার বস্তিবাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে এটিই হাংরি আন্দোলনের সম্পাদকের উপযুক্ত দপ্তর হতে পারে। সমীর রায়চৌধুরী শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে পাটনায় নিয়ে আসেন। এরপর চারজন মিলে সমীর রায়চৌধুরীর জন্মদিনে ১ নভেম্বর ১৯৬১ তে পাটনা থেকে ইংরেজিতে প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে হারাধন ধাড়া নাম পরিবর্তন করে দেবী রায় হিসেবে এফিডেভিট করে নিয়েছেন। মলয় রায়চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শয়তানের মুখ' ১৯৬৩ সালে কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই বছরই 'ইল্লত' নাটকটি প্রকাশিত হয় 'কবিতীর্থ' পত্রিকায়। এর পর দীর্ঘ কবিতার পুস্তিকা 'জখম' প্রকাশিত হয়। ১৪০৫ বঙ্গাব্দে কবিতীর্থ থেকে 'ইল্লত', 'নপুংপুং' এবং 'হিবাকুষা' নাটক তিনটি একত্রে 'নাটকসমগ্র' নামে প্রকাশিত হয়। হাংরি আন্দোলনের পরে লেখা কবিতা নিয়ে ১৯৮৭ সালে মহাদিগন্ত থেকে প্রকাশিত হয় 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর'। ১৯৯৫ তে কবিতা পাক্ষিক থেকে প্রকাশিত হয় 'চিৎকারসমগ্র'। সেই বছরই কবিতীর্থ থেকে প্রকাশিত হয় কবিতার পুস্তিকা 'ছত্রখান'। ১৯৯৬ তে কৌরব থেকে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ 'যা লাগবে বলবেন'। এরপর ২০০০ সালে গ্রাফিত্তি থেকে প্রকাশিত হয় কবিতার বই 'আত্মধ্বংসের সহস্রাব্দ'। ২০০১ সালে সৃষ্টি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয় 'পোস্টমডার্ন আহ্লাদের কবিতা'। ২০০৩ সালে কবিতা ক্যাম্পাস থেকে প্রকাশিত হয় 'কৌণপের লুচিমাংস'। মলয়ের নিজের অনুবাদগ্রন্থ 'Selected Poems' রাইটার্স ওয়ার্কশপ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। মলয়ের প্রথম উপন্যাস

'ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। এছাড়া জলাঞ্জলি (১৯৯৭), 'নামগন্ধ' (১৯৯৯), নখদন্ত (২০০২), 'অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস' (২০১২), 'অরূপ তোমার এটোঁকাটাঁ' (২০১৩), 'তিনটি নষ্ট উপন্যাস' (২০১৮, 'রাহুকেতু', 'লাবিয়ার মাকড়ি', 'ঔরস')। প্রথম গল্পের বই 'ভেন্নগল্প' প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। মলয়ের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'পোস্টমডার্নিসম' ১৯৯৫ তে প্রকাশিত হয়। এছাড়া রয়েছে 'পরাবাস্তববাদ' (১৯৯৭), 'আধুনিকতার বিরুদ্ধে কথাবার্তা' (১৯৯৯), 'মতান্তর' (২০০০), 'পোস্টমডার্ন কালখণ্ড ও বাঙালির পতন' (২০০০)। হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে দুই খণ্ডে লিখেছেন 'হাংরি কিংবদন্তি' (১৯৯৪, ২০১৩)। এছাড়া স্মৃতিকথা 'ছোটোলোকের ছোটোবেলা' (২০০৪), 'ছোটোলোকের যুববেলা' (২০১৫) উল্লেখ্য।

২। শ্রুতি

মুখপত্র : ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে রমানাথ রায়ের সম্পাদনায় 'এই দশক' নামে একটি বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল। দাম দশ পয়সা, অত্যন্ত ক্ষীণকায়। এই বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তরুণ কবি ও গল্পকারদের একটি দল। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ছাপা হতো এই বুলেটিনে। তবে 'এই দশক' বুলেটিন প্রকাশের আগে গল্পের ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিরোধিতা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল 'বিদিশা' নামে একটি গল্প-পত্রকে কেন্দ্র করে। 'এই দশক' পত্রিকার অষ্টম সংকলনে 'কয়েকটি তথ্য' শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়েছে,

> ছোটগল্পে শাস্ত্রবিরোধীতার আভাস প্রথম পাওয়া যায় 'এই দশকের'ই কয়েকজন লেখককে নিয়ে প্রকাশিত 'বিদিশা' নামের একটি গল্প-পত্রে। 'বিদিশা' পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হবার মুখে 'এই দশক' নামে বেশ কয়েকটি বুলেটিন বেরিয়েছিল বিভিন্ন সময়ে। প্রথম সংখ্যাটি বেরিয়েছিল ১৯৬২-এর এপ্রিলে। বুলেটিনগুলোতে ষাটদশকের তরুণ কবি ও গল্পকারের প্রথামুক্ত চিন্তা কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের আকারে মূর্ত হত।[১১]

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত 'এই দশক' বুলেটিনের মোট নয়টি সংখ্যা বেরিয়েছিল। এরপর এই বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত কবি ও গল্পকাররা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান। এই কবিরাই ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে 'শ্রুতি' নামে একটি কবিতা-পত্রিকা প্রকাশ করে শ্রুতি আন্দোলন শুরু করেন। অন্যদিকে এই বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত গল্পকাররাই ১৯৬৬

সালের মার্চ মাসে ‘এই দশক’ পত্রিকা প্রকাশ করে শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান।

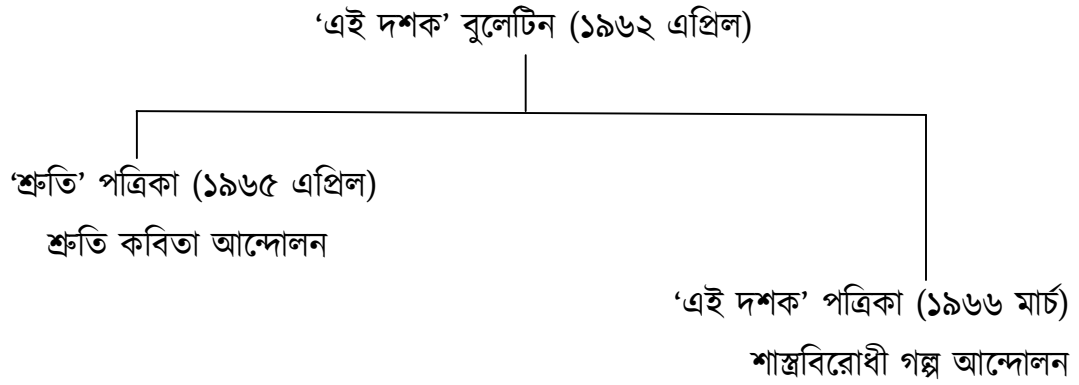

১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ‘শ্রুতি’ পত্রিকার মোট চোদ্দটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সংখ্যাগুলির তালিকা নিম্নলিখিত –

১। **‘শ্রুতি’** প্রথম সংকলন, এপ্রিল ১৯৬৫	সম্পাদকহীন
২। **‘শ্রুতি’** দ্বিতীয় সংকলন, জুলাই ১৯৬৫	সম্পাদকহীন
৩। **‘শ্রুতি’** তৃতীয় সংকলন, নভেম্বর ১৯৬৫	সম্পাদকহীন
৪। **‘শ্রুতি’** চতুর্থ সংকলন, মার্চ ১৯৬৬	সম্পাদকহীন
৫। **‘শ্রুতি’** পঞ্চম সংকলন, জুলাই ১৯৬৬	সম্পাদকহীন
৬। **‘শ্রুতি’** ষষ্ঠ সংকলন, তারিখহীন	সম্পাদক পরেশ মণ্ডল, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। **‘শ্রুতি’** সপ্তম সংকলন, জানুয়ারি ১৯৬৮	সম্পাদক সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল
৮। **‘শ্রুতি’** অষ্টম সংকলন, এপ্রিল ১৯৬৮	সম্পাদক সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল
৯। **‘শ্রুতি’** নবম সংকলন, জুলাই ১৯৬৮	সম্পাদক মৃণাল বসুচৌধুরী
১০। **‘শ্রুতি’** দশম সংকলন, মার্চ ১৯৬৯	সম্পাদক মৃণাল বসুচৌধুরী

১১। **'শ্রুতি'** একাদশ সংকলন, জুন **১৯৭০** সম্পাদকহীন

১২। **'শ্রুতি'** দ্বাদশ সংকলন, অক্টোবর **১৯৭০** সম্পাদকহীন

১৩। **'শ্রুতি'** ত্রয়োদশ সংকলন, ফেব্রুয়ারি **১৯৭১** **সম্পাদক মৃণাল বসুচৌধুরী**

১৪। **'শ্রুতি'** চতুর্দশ সংকলন, আগস্ট **১৯৭১** **সম্পাদক মৃণাল বসুচৌধুরী**

কয়েকটি শ্রুতি সংকলনের প্রচ্ছদ এখানে তুলে ধরা হল –

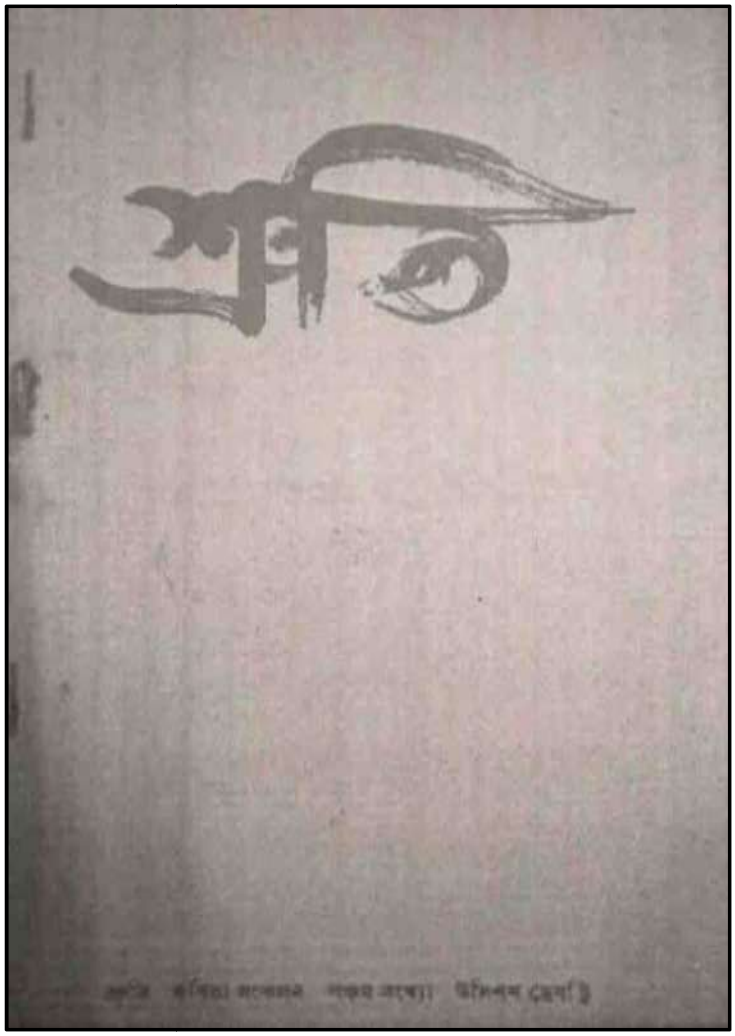

'শ্রুতি' পঞ্চম সংকলন জুলাই **১৯৬৬**

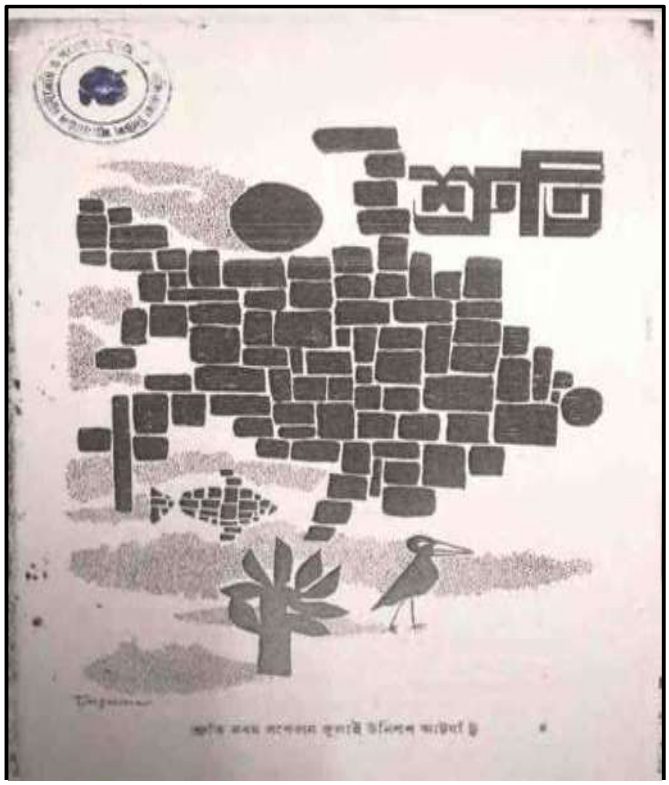

'**শ্রুতি**' নবম সংকলন জুলাই ১৯৬৮

'**শ্রুতি**' দশম সংকলন মার্চ ১৯৬৯

'**শ্রুতি**' দ্বাদশ সংকলন অক্টোবর **১৯৭০**

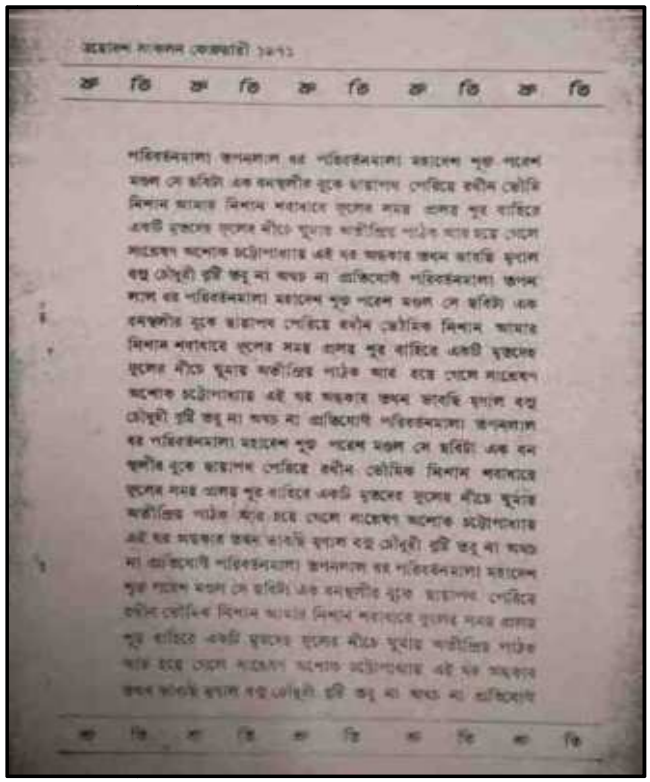

'**শ্রুতি**' ত্রয়োদশ সংকলন ফেব্রুয়ারি **১৯৭১**

মতাদর্শ : শ্রুতি কবিদের মতাদর্শগত অবস্থানটিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁদের লেখা কবিতা বিষয়ক বেশ কিছু নিবন্ধ থেকে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পুষ্কর দাশগুপ্ত 'কবিতা সম্পর্কে' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন "জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজ-চিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়।"[১২] বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, এটি সমকালীন বাংলা কবিতার প্রতিক্রিয়াজাত; মূলত হাংরিদের দিকে ইঙ্গিত করে।

প্রচলিত আধুনিক কবিতা সম্পর্কে একদল কবি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়েই নতুন ধরণের কবিতা চর্চার তাগিদে 'শ্রুতি' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রুতির দশম সংকলনে 'শ্রুতি সম্পর্কে' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল -

> প্রচলিত আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিছু চমক আর চটক মিশিয়ে ছাপার মত 'আধুনিক কবিতা' লেখা যে খুবই সহজ ব্যাপার, কিছুদিনের ছন্দ-মিলের চর্চার পর তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আর এই বাংলাদেশে, আর যাই কঠিন হোক না কেন, আধুনিকতার তৈরী ডিকশন মেনে চলনসই কবিতা ছাপানোটা মোটেই শক্ত নয়। আমরাও এরকম কবিতা লিখে, ছাপিয়ে অবশেষে ক্লান্ত এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লাম। আমরা এই গতানুগতিকতার চর্চা থেকে বেরিয়ে সবকিছু পালটে দিতে, কবিতাকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে চাইলাম। আমরা কয়েকজন, যারা কবিতা লেখার সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, নতুন করে কবিতা লেখার প্রেরণায়, মানসিকতার সাধর্ম্যে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম; আমরা কয়েকজন, যারা কফিখানায়, চায়ের টেবিলে, পথের ভীড়ে চলতে চলতে কবিতার নতুন পথের কথা ভাবতাম, তা নিয়ে আলোচনা করতাম, তর্ক করতাম; নতুন করে কবিতা লেখার তাগিদে আমরা মিলিত হলাম। অবশেষে আমাদের চিন্তা এবং চেষ্টা এক হল। শ্রুতি বেরোল। প্রচলিত আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে শ্রুতি প্রথম প্রতিবাদ।[১৩]

তথাকথিত আধুনিকতার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন শ্রুতি কবিরা। শ্রুতির দ্বিতীয় সংকলনে বলা হয়েছিল,

> চমকদার শব্দ, তির্যক বাচনভঙ্গী, রাজনৈতিক প্রচার, নীতি বা দুর্নীতি, জৈব-কাতরতা, তরল ভাবাবেগ এবং চতুর বাচালতার প্রতি আমাদের তীব্র বিরাগ। কেননা এসব নিতান্ত বাহ্যিক ব্যাপার এবং এ-নিয়ে কবিতা হতেই পারেনা। তাই চতুর, চমকদার, শ্লীল বা অশ্লীল, গদগদ এবং চিৎকৃত যেসব বাক্যবন্ধকে কবিতার নকল লেবেলে চালানোর চেষ্টা এখনো হচ্ছে, আমাদের কাছে তার মূল্য আবর্জনার বেশী নয়। এই আবর্জনা সৃষ্টিকারী লিপিকরদের আমরা এবার বিরত হতে পরামর্শ দিচ্ছি। আর তাঁদের কবিতা-রচনার এই অক্ষম, হাস্যকর প্রয়াসই যদি আধুনিকতা হয় তবে আমরা সেই আধুনিকতার সমাপ্তি ঘোষণা করছি।[১৪]

'শ্রুতি' পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যার শেষে 'শ্রুতি সম্পর্কে'[১৫] শিরোনামে সূত্রাকারে বলা কয়েকটি কথা থেকেও এই আন্দোলনের মতাদর্শগত অবস্থানটিকে চিনে নেওয়া যায় –

> ১। কোনরকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব-প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।

২। চিৎকার বা বিবৃতি - এর কোনটাই কবিতা নয়। রাজনীতি-প্ররোচিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর জৈব মত্ততার স্থান আর যেখানেই থাকুক কবিতায় নেই।

৩। ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা, তাই কবিতা হবে ব্যক্তিগত - মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী।

৪। এছাড়া কবিতায় কোন একমুখী বক্তব্য বা একটিমাত্র বিষয় থাকে না, থাকে বহু অনুভবের মিলনে জটিল উপলব্ধির আবহ।

৫। ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য দরকার ব্যক্তিগত রচনারীতি। আর রচনাপদ্ধতি এবং রচনার বিষয় অবিচ্ছেদ্য। তাই বিবৃতিধর্মী জীর্ণ প্রকাশপদ্ধতি ত্যাগ করে সব সময়ই উপযুক্ত প্রকাশ-রীতি খুঁজতে হবে, যার মাধ্যমে রচনা করা যায় ব্যক্তিত্বের সেই রহস্যময় পরিমণ্ডল যাতে থাকে দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ-স্বাদ-স্পর্শের ব্যাখ্যাতীত সমন্বয়। ইত্যাদি।

এছাড়া শ্রুতির সপ্তম সংখ্যাতেও বলা হয়েছিল –

কবিতা চিৎকার নয়, নিবিষ্ট উচ্চারণ।
কবিতা কারিগরী নির্মাণ নয়, শিল্পসৃষ্টি।
কবিতা বক্তৃতা বা প্রচার নয়, নিবিড় অভিজ্ঞতা।
কবিতা বুদ্ধির চমক নয়, ব্যাকুল সন্ন্যাস।[১৬]

যেহেতু শ্রুতি আন্দোলনের বিষয়গত অভিমুখ ছিল অন্তর্মুখী, এবং শ্রুতি কবিরা শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ছিলেন সংহত; তাই কবিতার ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা আঙ্গিকের আশ্রয় নিলেন। কবিতার স্তবক, পঙ্‌ক্তি, শব্দ ভেঙে এমন ভাবে সাজালেন, যাতে কবিতার ভাবটি একটা আদল পায়। তাই শ্রুতি কবিদের হাতে কবিতা ও চিত্রকলা মিশে যেতে দেখা যায়। কবিতার বিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন তাঁরা। শ্রুতির দ্বিতীয় সংখ্যায় পুষ্কর দাশগুপ্ত 'কবিতার মুদ্রণ-বিন্যাস' শীর্ষক নিবন্ধে এপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "মুদ্রণের উন্নত অবস্থায় কবি সম্ভাব্য উপায়ে এবং প্রয়োজন অনুসারে কবিতার বিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিতে পারেন এবং তার মুদ্রিত উপস্থাপনাও সম্ভব। কবিতায় কোন শব্দ বা চরণকে বিশেষভাবে বা বিশেষ হরফে ছাপিয়ে কবি তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত অনুভবের স্তর এবং বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত করতে পারেন। এছাড়া বিশেষ কোন ছক বা আকারে কবিতাকে বিন্যস্ত করে কবি তাঁর মানসিক অনুষঙ্গকে সাংকেতিক করতে পারেন।"[১৭] এছাড়া শ্রুতির দশম সংকলনেও এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছিল –

শব্দ ও বাক্যের প্রকাশের সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবহার-জীর্ণতাকে পার হওয়ার প্রয়োজনবোধে আমরা শ্রুতিতে কবিতার আঙ্গিকের পরিবর্তনের সূচনা করেছিলাম। আমরা যা করেছি তার মধ্যে ছিল:

১। নতুন ধরণের মুদ্রণবিন্যাসের সাহায্যে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য (visual) অনুষঙ্গ সৃষ্টি।

২। ছেদচিহ্নের বিলোপ। প্রয়োজন মত স্পেস ও বিশেষ পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে কোথায় থেমে পড়তে হবে তার নির্দেশ। কবিতার ভাষায় মুখের কথায় স্বাভাবিক ব্যঞ্জনাসৃষ্টি।

৩। অনুভবের অবলম্বন বিশেষ শব্দের গুরুত্ব অনুসারে তাকে অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে বা বেশি স্পেস দিয়ে একেবারে আলাদা করে দেখানো; অথবা বিশেষ কোন শব্দকে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হরফ থেকে আলাদা হরফে ছাপিয়ে তার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ। কখনো বা শব্দের প্রতিটি বর্ণকে স্পেসের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গানের লয়ের মতো উচ্চারণবৈশিষ্ট্য তৈরী করা। সমস্ত মিলিয়ে কবির অনুভবের ক্রমভেদে উচ্চারণের ওঠানামার নির্দেশ দেওয়া।

৪। ব্যাকরণের বিরোধিতা। ভাষা-ব্যবহারে বাক্যপ্রকরণের যুক্তি নির্ভরতার বর্জন। শব্দকে বাক্যের অংশ বা পদ হিসেবে না ভেবে প্রতিটি শব্দকে একক গুরুত্বে ব্যবহার করা। সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া-বিশেষণ, বিশেষণ ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় ভারসৃষ্টিকারী শব্দকে যথাসম্ভব পরিহার করা।

৫। প্রচলিত ছন্দকে বর্জন করে বা ভেঙে কবিতার ভাষায় ব্যক্তিগত উচ্চারণের স্বতন্ত্র ছন্দ-স্পন্দন সৃষ্টি।[১৮]

শ্রুতি আন্দোলনের আরেকজন অন্যতম প্রধান কবি পরেশ মণ্ডলও কবিতার নিত্যনতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলেছিলেন। শ্রুতির চতুর্দশ সংকলনে 'কবিতা সম্পর্কে' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে তাঁর সেই বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হল -

কবিতা হচ্ছে আত্মগোপনের ইতিহাস। শব্দ তার মাধ্যম। তাই শব্দকে ঘিরে যতো সংগ্রাম। শব্দের সংস্থান বদলে, শব্দকে গুঁড়ো করে, গুঁড়োগুলোকে উল্টেপাল্টে জুড়ে দিই। আবার অপরিচিত শব্দকে পরিচিতের মধ্যে খুঁজতে চাই। পরিচিতকে অচেনা পটভূমিতে। এবং প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা করতে করতে চলি। কেননা জীবন এক পরীক্ষাকেন্দ্র। কেননা আমি জীবনকে ভালোবাসি। কেননা আমি মানুষকে ভালোবাসি। পৃথিবীকে, মহাকাশের জগৎকে। বোধ হয়, এক রক্তাক্ত ভালোবাসা থেকেই কবিতার জন্ম। এবং কবিতার অন্য নাম যুদ্ধ। নিজের সঙ্গে নিজের। আর সে যুদ্ধের প্রকাশ নতুন আঙ্গিকে। কিন্তু বিশেষ কোনো আঙ্গিক যখন পরিণতির শেষ বিন্দুকে স্পর্শ করে তখন তাকে ছুঁড়ে ফেলি। নতুন আঙ্গিকের খোঁজ করি।[১৯]

শ্রুতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম কবি অশোক চট্টোপাধ্যায়ও পরবর্তীকালে 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন "বুলেটিন বা পরে এই দশক ও শ্রুতি ঘোষণাতেও ছিল রীতির উপর গুরুত্ব – 'কবিতার ইতিহাস তার আঙ্গিকের ইতিহাস', লুই আরাগঁর বিখ্যাত উক্তি এঁরা আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। শোক, দুঃখ, আবেগ, প্রেম, বিরহ এই সবই তো সাহিত্যের বিষয় – চিরকালই ছিল, এবং থাকবে। শুধু কালে কালে তার প্রকাশটাই আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং এই 'প্রকাশ'-এর অর্থাৎ আঙ্গিক বা রীতিরই চর্চা দেখা গেল শ্রুতি গোষ্ঠীর সচেতন আন্দোলনকারীদের মধ্যে।"[২০] শ্রুতি কবিতার

দৃষ্টিগ্রাহ্যতা প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিচারণা করে বলেছেন, "শ্রুতির প্রথম সংখ্যাতেই পুষ্করের সূর্যস্তোত্র দিয়ে শুরু। টাইপ সাজিয়ে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের প্রকাশ। সমসময়ে এসব রচনা প্রবলভাবে সমালোচিত, কখনো ধিকৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন টাইপোগ্রাফি, কেউ বা বিস্ময় প্রকাশ করেছে – এরা কি আগের জন্মে কম্পোজিটর ছিল!"[২১] আসলে শ্রুতি কবিদের প্রধান আপত্তি ছিল কোনো নির্দিষ্ট রূপের বন্ধনে নিজেদের স্বাধীন সৃষ্টি-কল্পনাকে বন্দী করে রাখাতে। ফলত তাঁরা কবিতার রূপের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠলেন; স্পেসের তাৎপর্যময় প্রয়োগ ঘটালেন শব্দ ও পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে, কবিতায় ব্যাকরণগত যুক্তি-পারম্পর্য ভেঙে শব্দকে একক স্বাধীন মহিমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক একটি পঙ্‌ক্তিতে এক একটি শব্দকে বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করলেন - যার দ্বারা আবেগের উচ্ছ্বসিত স্রোতকে যেমন তাঁরা একদিকে রুখতে চাইলেন, তেমনি অন্যদিকে পাঠকের মনে একটি আবহ সঞ্চারও করলেন। শ্রুতির নবম সংকলনের শেষে বলা হয়েছিল,

> চিরাচরিত পথের মোহ ত্যাগ করে কিছু তরুণ কবি কবিতায় নতুন পথ আবিষ্কারে প্রয়াসী। কবিতা সম্পর্কে নিজেদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে এঁরা বাংলা কবিতায় নতুন সৃজনশীল অধ্যায়ের সূচনা করতে চান। 'শ্রুতি' এই আন্দোলনের মুখপত্র।[২২]

শ্রুতি আন্দোলনের ভাষারীতি প্রসঙ্গে এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় পুষ্কর দাশগুপ্ত বলেছিলেন, "উপলব্ধির গভীরতাকে, নব নব আত্মিক অভিজ্ঞতাকে ভাষায় যথার্থ প্রকাশ করতে না পারার অতৃপ্তি এবং সংশ্লিষ্টভাবেই ব্যবহৃত ভাষাপদ্ধতির জীর্ণতা সম্পর্কে অনুভব প্রত্যেক সচেতন কবির মনে সদাজাগ্রত।"[২২] সপ্তম সংখ্যায় 'কবিতা সম্পর্কিত ঘোষণা ২' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, "ভেঙে ফেলতে হবে সমস্ত প্রথার শাসন, ছিন্ন করতে হবে সংস্কারের সমস্ত বন্ধন। শব্দকে ব্যবহৃত বাক্যবন্ধের আবর্জনা থেকে এক এক করে বেছে নিতে হবে। তৈরী করতে হবে ব্যক্তিগত এবং অনন্য, এক প্রচলমুক্ত বাকরীতি।"[২৪] আবার দশম সংখ্যায় বলা হয়েছিল ব্যাকরণের বিরোধিতার কথা, বাক্য-প্রকরণের যুক্তি নির্ভরতা বর্জনের কথা। শব্দকে বাক্যের অংশ বা পদ হিসাবে না ভেবে প্রতিটি শব্দকে একক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণ ইত্যাদি 'ভারসৃষ্টিকারী শব্দ'কে পরিহার; পাশাপাশি প্রচলিত ছন্দকে বর্জন করে বা ভেঙে কবিতার ভাষায় ব্যক্তিগত উচ্চারণের স্পন্দন সৃষ্টি করতে বলা হয়েছিল। শ্রুতি কবিরা কবিতাকে বুঝেছিলেন এভাবে -

> এইত সময় যখন কবিতা আরো পবিত্র, আরো শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। প্রাচীন কাল থেকে নীতিপ্রচার, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ইতিহাস-বর্ণনা, সমাজবিধান সম্পর্কিত চিন্তা প্রভৃতি যে সব প্রতারণার ভার কবিতাকে প্রায়শই বহন করতে হয়েছে কবিতা আজ তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কবিতার বাইরে কবিতার আর কোন দায়িত্ব নেই। কোনরকম প্রচারের সহযোগিতা করা কবিতার কাজ নয়, কবিতা স্বপ্রধান, স্বতন্ত্র। অন্যদিক থেকে কবিতার অলংকার-শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বন্ধনও ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কবিতা আজ স্বাধীন।... কবিতায়

কবির উপজীব্য আত্মঅন্বেষণ। এবং কবিতার একমাত্র বিষয় কল্পনাময় উপলব্ধি। এছাড়া আর কিছুই নয়। ... এছাড়া কবিতায় কোন তথাকথিত বক্তব্য বা বাস্তব অর্থ থাকে না, থাকে কবির বিচিত্র অনুভব সমন্বিত স্বপ্নময় আত্মিক আবহের প্রকাশ। পদ্য সহজ হতে পারে, সহজ কবিতা বলে কিছু হয় না। আবার তথাকথিত ভাবে 'দুর্বোধ্য কবিতা' বলেও কিছু হয় না। কারণ, কবিতার সঙ্গে 'বোঝার' কোন সম্পর্ক নেই, কবিতাকে উপলব্ধি করতে হয়।[২৫]

লেখকগোষ্ঠী : 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পাঁচজন কবি - পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, অনন্ত দাশ, পরেশ মন্ডল এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে শ্রুতির প্রথম চারটি সংখ্যার পরে অনন্ত দাশের আর কোনো লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তাই পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল এবং সজল বন্দ্যোপাধ্যায় – এই চার জন কবিকেই শ্রুতি আন্দোলনের প্রধান কবি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে পত্রিকার সাংগঠনিক কাজের পুরোধা ছিলেন মৃণাল বসুচৌধুরী এবং তাত্ত্বিক নেতৃত্ব ছিল পুষ্কর দাশগুপ্তের। শ্রুতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন – "শ্রুতি আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত ঘোষণা স্লোগান ইত্যাদি যৌথভাবে প্রকাশিত হলেও এগুলি বেশীর ভাগই পুষ্কর দাশগুপ্তের রচনা ও পরিকল্পনা ছিল। ... কবিতায় ভাষার ব্যবহারে, স্তবক বিন্যাসে, শ্রুতিদর্শন ও অনুশাসনে প্রাণিত সার্থক কবি হয়েও শ্রুতিসঙ্ঘের সর্বাধিক সংগঠন ক্ষমতার অধিকারী মৃণাল। প্রকৃতপক্ষে প্রধানত ওরই উদ্যোগে 'শ্রুতি'র প্রকাশ দশম সংখ্যা (মার্চ ১৯৬৯) পর্যন্ত মসৃণভাবে ঘটেছে। তারপরও, যখন শ্রুতিপরিষদ অবসন্ন, প্রায় মুমূর্ষ, মৃণাল একক উদ্যোগে তারপরও, একাদশ থেকে চতুর্দশ চারটি সংখ্যা প্রকাশ করে শ্রুতির পুনর্জীবনের জন্য শেষ ব্যর্থ চেষ্টা করে।"[২৬] এছাড়াও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আরও অনেকে। শ্রুতি পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যার অনুবাদ কবিতাগুলি ছাড়াই বাকি তেরোটি সংখ্যায় মোট তেইশ জন কবিকে পাই আমরা। তাঁরা হলেন -

১। মৃণাল বসুচৌধুরী
২। পুষ্কর দাশগুপ্ত
৩। অনন্ত দাশ
৪। পরেশ মণ্ডল
৫। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। সুকুমার ঘোষ

৭। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

৮। তপনলাল ধর

৯। গৌরাঙ্গ ভৌমিক

১০। রত্নেশ্বর হাজরা

১১। কালীকৃষ্ণ গুহ

১২। মদন মোহন বিশ্বাস

১৩। প্রভাতকুমার দাস

১৪। স্বপন সেনগুপ্ত

১৫। কালিপদ কোঙার

১৬। অভি সেনগুপ্ত

১৭। প্রলয় শূর

১৮। অশোক চট্টোপাধ্যায়

১৯। রথীন ভৌমিক

২০। অতীন্দ্রিয় পাঠক

২১। বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য

২২। নিশিনাথ সেন

২৩। রবীন সুর

এখন প্রধান চার জন শ্রুতি-কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে শ্রুতি সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনার ইতি টানা যাক।

মৃণাল বসুচৌধুরী : জন্ম ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর গ্রামে। পিতা সুধীর বসুচৌধুরী, মা শেফালী বসুচৌধুরী। পিতামাতার একমাত্র সন্তান তিনি; মাত্র দুই বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। ফলত চরম দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে তাঁর বাল্য ও কৈশোর। জয়নগর ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৫৮ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। এরপর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আই.এস.সি. পড়া শুরু। ১৯৬৪ সালে বি.এ. পাশ করেন। ১৯৬৫ সালে বাংলায় স্পেশাল অনার্স নিয়ে ও ১৯৬৭ সালে বাংলায় এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিছুদিন (১৯৬৭-৬৯) ফরাসী ভাষাও শিখেছেন তিনি অন্যান্য শ্রুতিকবিদের সঙ্গেই। তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৫৯ সালে 'অভিনব অগ্রণী' পত্রিকায়। এরপর কবিপত্র, গঙ্গোত্রী, ক্রান্তদর্শী, কৃত্তিবাস, অমৃত, দেশ ইত্যাদি পত্রিকায় লিখেছেন।

সম্পাদনা করেছেন কথাকলি, আগন্তুক, মাসিক বাংলা কবিতা, শ্রুতির দু'টি সংকলন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল - 'মগ্ন বেলাভূমি' (১৩৭২/১৯৬৫), 'শহর কলকাতা' (বৈশাখ ১৩৭৭/ ১৯৭০), 'যেখানে প্রবাদ' (আশ্বিন ১৩৭৯/ ১৯৭২), 'গুহাচিত্র' (মাঘ ১৩৮২/১৯৭৬), 'এই নাও মেঘ' (১৯৮১), 'শুধু প্রেম' (১৯৮২), 'ধারাবাহিক অবহেলা' (১৯৮৭), 'কবিতা সংগ্রহ' (১৯৯৯), 'এবার ফেরো সন্ন্যাসে' (২০০০), 'শব্দনির্মাণ' (২০০১), 'যদি ওড়ে উড়ে যায়' (২০০২), 'মায়াবী উত্তাপ' (২০০৩), 'নির্বাচিত কবিতা' (২০০৩), 'স্বর্গ থেকে নীলপাখি, স্বপ্নে সমর্পণে' (২০০৫), 'শূন্যতার ছায়া' (২০০৫), 'নিঃশব্দ সাঁতার' (২০০৬), 'যাদুঘরে শব্দহীন' (২০০৭), 'মায়াবন্দরের দিকে' (২০০৯), 'ঘুম উড়ে আসে' (২০১০), 'বিকল্প চাঁদের কাছে' (২০১১), 'আসছি দাঁড়াও' (২০১১), 'তবে কি ফিরেই যাবো' ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর লেখা উপন্যাস হল – 'ভুল' (১৯৮২); গল্পগ্রন্থ – 'যন্ত্রণার এপিঠ ওপিঠ' (২০০৬); প্রবন্ধগ্রন্থ – 'শব্দ স্মৃতিঘর' (২০১১)। এছাড়াও শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন – 'এখন যদি রবিঠাকুর' (২০০৩), 'তিনের পিঠে দুই' (২০০৮), 'অদ্ভুত সব ভূত' (২০০৭)।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮ (১৯৪২), শ্যামবাজারে। পিতা সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মা জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়। তেলেনীপাড়া ভদ্রেশ্বর হাইস্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন। এরপর চন্দননগর কানাইলাল কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন ১৯৬০ সালে এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন ১৯৬২ সালে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা করেছেন। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু। মাসিক বসুমতী পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৫৯ সালে। ষাটের দশকে কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিলেন নীলাঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে। এছাড়া ১৯৮৪ সালে তিনি বাইবেলের দুটি ভাগই অনুবাদ করেছেন তিন খন্ডে, ফাদার সি মিয়োঁর সাথে যুগ্মভাবে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল – 'তৃষ্ণা, আমার তরী' (মার্চ ১৯৬৬), 'স্বপ্নে উপকূলে' (মার্চ ১৯৭৭), 'পিকাসোর নীল জামা' (ডিসেম্বর ১৯৭৯), 'মিড়' (১৯৮১), 'ব্রায়ার পাইপ' (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪), 'ভ্রমণ' (১৯৮৬), 'পান্ডু(র) লিপি' (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯), 'আগুনের বিবরণ' (বৈশাখ ১৪১৮), 'কথাবিন্দু' (২০০৪), 'নির্বাচিত কবিতা' (জানুয়ারি ১৯৯৪) ইত্যাদি।

পুষ্কর দাশগুপ্ত : জন্ম ১৯৪১ সালের ২৮ মার্চ, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। পিতা রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মা সরোজপ্রতিমা দাশগুপ্ত। ১৯৬২ সালে তিনি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এরপর ১৯৬৫ সালে স্পেশাল অনার্স (বাংলা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পেশা হিসেবে

মানিকতলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। এছাড়া ফরাসী ভাষা-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আলিয়ঁস ফ্রাসেঁজে ফরাসী শিখিয়েছেন বহুদিন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল – 'এখানে আমি' (জুন ১৯৬৭), 'শব্দ শব্দ' (নভেম্বর ১৯৭১), 'কলিকাতা সমাচার' (১৯৮৬), 'ভলতের/জাদিগ ও অন্যান্য উপাখ্যান' (অনুবাদ, জানুয়ারি ১৯৮৫), 'বিশ শতকের ফরাসী কবিতা/ আটজন কবি' (সম্পাদিত), 'আপলিনের কবিতা' (অনুবাদ অগাষ্ট ১৯৮৮), 'লোরকোর কবিতা' (অনুবাদ, মে ১৯৯০), 'নির্বাচিত কবিতা' (জানুয়ারি ১৯৯৬), 'ভলতের/আমাবেদের পত্র' (অনুবাদ, এপ্রিল ২০০৭) ইত্যাদি।

পরেশ মণ্ডল : জন্ম ১৯৪০ সালের ৩ মার্চ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার মৌখালি গ্রামে। পিতা কানাইলাল মণ্ডল, মা দুর্গেশনন্দিনী মণ্ডল। সিটি কলেজ থেকে ১৯৬১ সালে বি.এ. পাশ করেন তিনি। এরপর ১৯৬৩ সালে স্পেশাল অনার্স (বাংলা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. করে, অমিয় চক্রবর্তীর ওপর গবেষণাকাজ শুরু করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ইস্টার্ন রেলওয়েতে যোগদান করেছিলেন। তাঁর লেখালেখির শুরু শৈশব থেকেই। স্কুল জীবনে 'অঙ্কুর' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। পরে দেশ, অমৃত, পরিচয়, বসুধারা, কবিপত্র, মহাদিগন্ত ইত্যাদি পত্রিকায় লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল – 'অদূরে জলের শব্দ' (আশ্বিন ১৩৭০/১৯৬৩), 'প্রতিবিম্ব' (১৯৬৬), 'মানমন্দির' (বৈশাখ ১৩৭৬/ ১৯৬৯), '৪৪৪' (বৈশাখ ১৩৭৯/১৯৭২), 'পেন্ডুলাম' (বৈশাখ ১৩৮৬/মে ১৯৭৯), 'লোডশেডিং' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪), 'হাত' (জানুয়ারি ১৯৮৬), 'শেষ এবং শুরু' (জানুয়ারি ১৯৮৯), 'নির্বাচিত কবিতা' (জানুয়ারি ১৯৯৬), 'নিজস্ব বলয়' (বৈশাখ ১৪০৮), 'কবিতা সংগ্রহ' (জানুয়ারি ২০১২) ইত্যাদি।

৩। শাস্ত্রবিরোধী

মুখপত্র : 'এই দশক' বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত গল্পকাররা ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে 'এই দশক' পত্রিকা প্রকাশ করে শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। এর পূর্ব-ইতিহাস এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে ইতোপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র 'এই দশক' পত্রিকার মোট সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল চব্বিশটি। সংখ্যাগুলির তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হল –

১। '**এই দশক**' প্রথম সংকলন, ফাল্গুন ১৩৭২

২। '**এই দশক**' দ্বিতীয় সংকলন, আষাঢ় ১৩৭৩

৩। '**এই দশক**' তৃতীয় সংকলন, পৌষ ১৩৭৩

৪। '**এই দশক**' চতুর্থ সংকলন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

৫। '**এই দশক**' পঞ্চম সংকলন, অগ্রহায়ণ ১৩৭৪

৬। '**এই দশক**' ষষ্ঠ সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৫

৭। '**এই দশক**' সপ্তম সংকলন, শ্রাবণ ১৩৭৫

৮। '**এই দশক**' অষ্টম সংকলন, পৌষ ১৩৭৫

৯। '**এই দশক**' নবম সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৬

১০। '**এই দশক**' দশম সংকলন, ভাদ্র ১৩৭৬

১১। '**এই দশক**' একাদশ সংকলন, মাঘ ১৩৭৬

১২। '**এই দশক**' দ্বাদশ সংকলন, আষাঢ় ১৩৭৭

১৩। '**এই দশক**' ত্রয়োদশ সংকলন, কার্তিক ১৩৭৭

১৪। '**এই দশক**' চতুর্দশ সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৮

১৫। '**এই দশক**' পঞ্চদশ সংকলন, ১৩৭৮

১৬। '**এই দশক**' ষোড়শ সংকলন, বৈশাখ ১৩৭৯

১৭। '**এই দশক**' সপ্তদশ সংকলন, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯

১৮। '**এই দশক**' অষ্টাদশ সংকলন, মাঘ ১৩৮০

১৯। '**এই দশক**' উনবিংশ সংকলন, ১৩৮১

২০। '**এই দশক**' বিংশ সংকলন, মাঘ ১৩৮১

২১। '**এই দশক**' একবিংশ সংকলন, ১৩৮২

২২। '**এই দশক**' দ্বাবিংশ সংকলন, তারিখহীন

২৩। '**এই দশক**' ত্রয়োবিংশ সংকলন, তারিখহীন (১৯৭৮?)[২৭]

২৪। '**এই দশক**' চতুর্বিংশ সংকলন, তারিখহীন (১৯৮১?)[২৮]

শেষ তিনটি সংকলনে প্রকাশকাল অনুল্লেখিত। তবে উত্তম দাশ তাঁর 'হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' গ্রন্থে ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ সংকলনের আনুমানিক প্রকাশকাল উল্লেখ করেছেন। **কয়েকটি শাস্ত্রবিরোধী সংকলনের প্রচ্ছদ এখানে তুলে ধরা হল -**

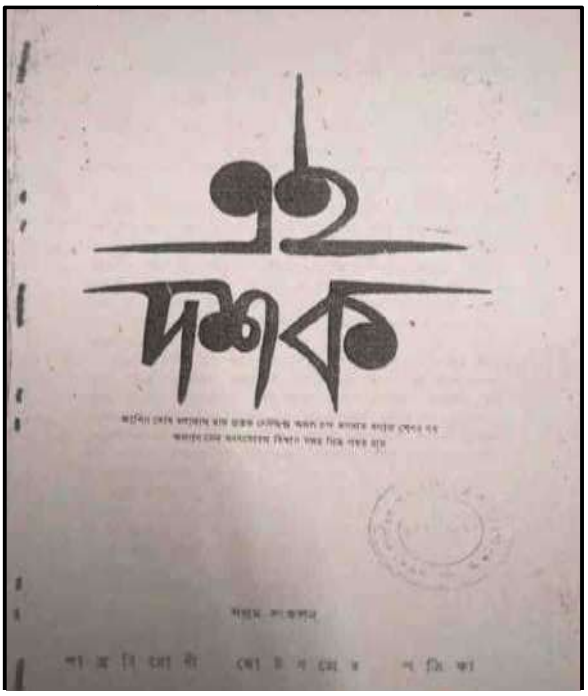

'**এই দশক**' সপ্তম সংকলন শ্রাবণ ১৩৭৫

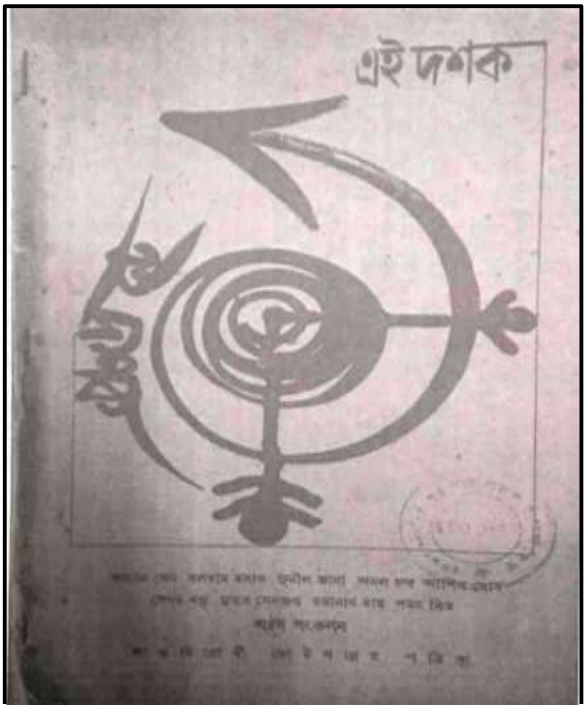

'**এই দশক**' অষ্টম সংকলন পৌষ ১৩৭৫

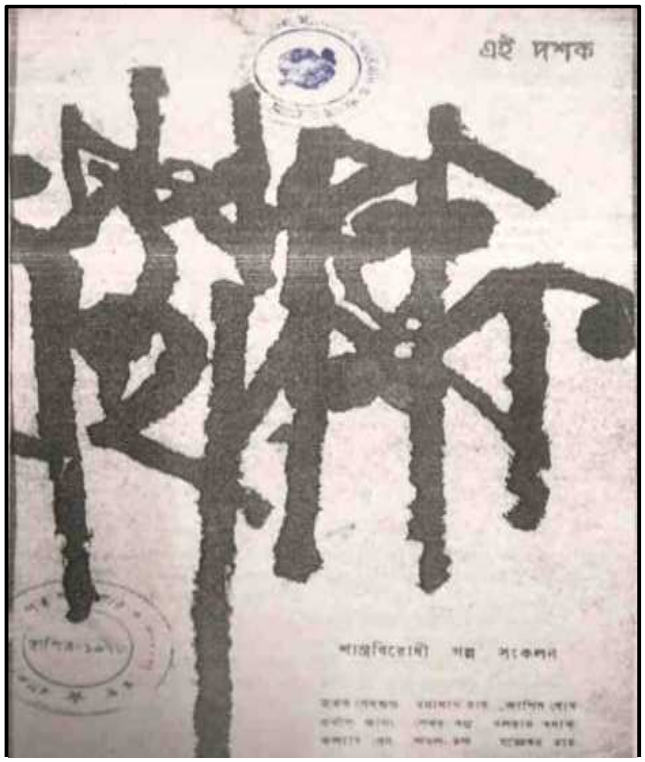

‘এই দশক’ ষোড়শ সংকলন বৈশাখ **১৩৭৯**

‘এই দশক’ অষ্টাদশ সংকলন মাঘ **১৩৮০**

মতাদর্শ : 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি ছিল প্রচ্ছদে ছাপানো স্লোগানধর্মী কয়েকটি কথা। যেমন –

১. গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।

২. আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত।

৩. অতীতের সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ। আমাদের কাছে নয়।

৪. গল্পে এখন যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।

নবীন তেজের ঈষৎ ঔদ্ধত্য পত্রিকার পৃষ্ঠায় ঘোষিত হয়েছে। আপাত স্পর্ধিত এই সব উক্তিতে তারুণ্যের ঝাঁঝ ছিল ঠিকই; তবে একথা অস্বীকারের উপায় নেই, প্রচলিত বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত চেনা যাবতীয় চলনভঙ্গিকে অস্বীকার করে, প্রচলিত সব শর্তকে নস্যাৎ করে এই লেখকেরা সম্পূর্ণ নতুন পথে এগিয়েছিলেন। 'গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব' – এই 'আমাদের কথা' হল অন্তর্জগতের কথা। অন্তর্জগতের জটিল অনুভবই শাস্ত্রবিরোধী গল্পের বিষয়। 'আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত' – শাস্ত্রবিরোধী গল্প কী তাহলে অবাস্তবতার কথা বলে, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আদৌ তা নয়, তাঁরা বলেন অন্তর্বাস্তবতার কথা। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার শেখর বসু বলেছেন,

> শাস্ত্রবিরোধী লেখকেরা ছিলেন গভীরভাবে অন্তর্মুখী। বিশ্বাস করতেন, বাইরের চমকপ্রদ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক নেই। ... আমরা বিশ্বাস করতাম – বাইরের বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জ সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে না। আমরা আমাদের গল্পে ঘটনার ঘনঘটা থেকে দূরে থাকতাম সচেতন ভাবে। সচেতন ভাবেই তথাকথিত বাস্তবতার চর্চা করিনি।[২৯]

এঁরা সচেতনভাবেই সমাজক্ষুব্ধতা ও পরিপ্রেক্ষিতকে এড়িয়ে গিয়েছেন। 'অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধে অতীন্দ্রিয় পাঠক বলেছেন, "ব্যক্তিগত আলোচনায় অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি, তা হল, তিনি ছিলেন বাম-রাজনীতির সমর্থক, অথচ তাঁর লেখায় কোথাও তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।"[৩০] শাস্ত্রবিরোধী লেখকেরা তাঁদের রচনায় সমকালীন রাজনীতিকে এড়িয়ে গিয়েছেন সর্বদা। তৃতীয় বক্তব্যটি আর্তোর বিখ্যাত উক্তি "Masterpieces of past are good for the past, they are not good for us."-এর অনুবাদ।[৩১] পুরনোকে বর্জন করে নতুনকে গ্রহণ করার কথা বলেন শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা। তবে 'শেখর বসুর শাস্ত্রবিরোধী গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে রবিন পাল বলেছেন, "এঁরা বলতেন 'মহৎ' সাহিত্যের আর দরকার নেই, অতীত সাহিত্যের স্মরণ দরকার নেই। কিন্তু পূর্বসূরীদের সাহিত্য থেকে শেখার আছে বইকি। শেখর স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ,

ত্রৈলোক্যনাথ, সুকুমার রায়েরা তাঁদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। দু'একজন শাস্ত্রবিরোধী লেখকের ওপর কাফকার প্রভাব ছিল খুবই গভীর। আছেন দস্তয়েভস্কি, ফ্লবের, গোগল, চেকভ, জিদ, বেকেট, আলাঁ রবগ্রিয়ে, নাতালি সারোত। সতীর্থ কল্যাণ সেন ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুরাগী, অমল চন্দ 'ফ্রানজ কাফকার অসম্ভব ভক্ত।' ওরা নিউ ইয়র্ক টাইমস, এনকাউন্টার পড়তেন।"[৩২] চতুর্থ বক্তব্যটি ছাপা হয়েছিল মার্ক টোয়েনের অনুসরণে। 'The Adventures of Huckleberry Finn'-গ্রন্থের শুরুতেই মার্ক টোয়েন একটি নোটিস ছেপেছিলেন। তাতে লেখা ছিল —

> Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted ; persons attempting to find a moral in it will be banished ; persons attempting to find a plot in it will be shot.[৩৩]

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার রমানাথ রায় পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে বলেছেন — "পত্রিকার প্রচ্ছদে মার্ক টোয়েনকে কাজে লাগিয়েছিলাম। 'হাকলবেরি ফিন'-এর শুরুতে পাঠকদের উদ্দেশ্যে যে নোটিস লেখক দিয়েছিলেন তার থেকে একটা অংশের পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি বাক্য ব্যবহার করেছিলাম। বাক্যটি এই —'গল্পে এখনো যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।' সত্যি বলছি কাউকে গুলি করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। কেবলমাত্র পাঠকদের সঙ্গে একটু ইয়ার্কি মারার জন্যে বাক্যটি ছাপিয়েছিলাম। ... এই মজার বাক্যটি সেই সময় চারদিকে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। আমাদের ওপর অনেকে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন। অনেকে আবার মজাও পেয়েছিলেন।"[৩৪]

'শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্প এবং দশটি ঘোষণা'[৩৫] শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে রমানাথ রায় শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের যে দশবিধি নির্দেশ করেছেন, তা নিম্নলিখিত -

১। শিল্পের রাজ্য থেকে সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের আমূল উৎখাত।

২। যা কিছু এতকাল ছিল গম্ভীর এবং যুক্তিপূর্ণ তাই হাস্যকর।

৩। শিল্প ও সাহিত্যে শাস্ত্রসম্মত পথকে বর্জন করতে হবে। শিল্পের ইতিহাস আঙ্গিকের বিবর্তনের ইতিহাস।

৪। জীবন সম্পর্কে কোন রকমের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা করা বা মত দেওয়ার আমরা বিরোধী।

৫। সৎ অসৎ, বিশ্বাস অবিশ্বাস, পাপ পূণ্য ইত্যাদির ধারণা রীতিমত সংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিরক্তিকর। এসব শব্দ আমাদের কাছে এখন একেবারে অর্থহীন।

৬। পরীক্ষামূলক সাহিত্য কথাটা নির্বোধের উক্তি। সাহিত্য আর যাই হোক গবেষণাগার নয়।

৭। মহৎ সাহিত্য বা চিরকালের সাহিত্য বলে কোন সাহিত্য নেই। সব সাহিত্যই নিজের কালের ও যুগের।

৮। গল্প ও উপন্যাস থেকে পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক বা আঞ্চলিক সমস্যা, মনস্তত্ত্ব, প্রেম বা অপ্রেম, ভাবুকতা এবং বুদ্ধিমত্তাকে বর্জন করতে হবে।

৯। সাহিত্য থেকে সেকেলে কার্যকারণবাদকে ছুঁড়ে ফেলা হোক।

১০। সাহিত্য দীর্ঘদিনের সংস্কার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হোক।

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা এই সব জোরদার ঘোষণার দ্বারা বাংলা ছোটগল্পের প্রবহমান গতানুগতিকতাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন এক নতুন সম্ভাবনার পথে। শাস্ত্রবিরোধিতা বলতে এই গল্পকারেরা ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন, তা সম্পর্কে একজন অন্যতম শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার শেখর বসু বলেছেন, এই শাস্ত্র বলতে ধর্মশাস্ত্র নয়। শিল্প-সাহিত্যের গোঁড়া, সংস্কারাচ্ছন্ন, অবশ্য-পালনীয় নিয়মাবলিকেই এখানে শাস্ত্র বলা হয়েছে। এই শাস্ত্র হল সেই শাস্ত্র যা শিল্প-সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত করার বদলে রুদ্ধ করে। এই শাস্ত্র শাস্ত্রবিরোধীরা মানেন না। নতুন-নতুন পথ খোলার স্বার্থেই মানেন না। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার রমানাথ রায়ও বলেছেন,

> শাস্ত্রবিরোধীতা কোনো উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নয়। ... শাস্ত্রবিরোধীতা এক স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী। ... আমাদের কাছে আইনের কোনো মূল্য নেই। আমরা কোনোদিন আইন তৈরি করিনি। কাউকে করতেও বলি না। এ পৃথিবীতে আইন তৈরি করার অধিকার কারোর নেই; বিচারক হওয়ার অধিকারও কারোর নেই।[৩৬]

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা আদ্যন্ত গল্প বলার শৈলী পরিহার করে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি যখন এত মিশ্র, জটিল ও অনির্দিষ্ট, তখন গল্পে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়, নির্দিষ্ট সমস্যা থাকতে পারে। কখনো কেবলমাত্র ইমেজকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু চিত্রের সমষ্টি হয়ে উঠেছে গল্প। আবার কখনো, কোনো এক মুহূর্তের বিশেষ কোনো ভাবনার অংশ-বিশেষই গল্পকার পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন। গত শতকের তিন-চারের দশকে ছিল বিষয়ের বৈচিত্র; আর শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা নির্দিষ্ট বিষয়কেই অস্বীকার করলেন।

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা আদি-মধ্য-অন্ত্য সম্বলিত কোনো কাহিনি বা প্লটেও বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁদের প্রধান ও প্রথম আপত্তিই ছিল প্লট বা কাহিনী নির্মাণের বিরুদ্ধে। জীবন তো কাহিনির মতো কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত ঘটনাসমষ্টি নয়; বরং জীবন অনেক বেশী এলোমেলো এবং যুক্তিবিরোধী। তাই তাঁদের মতে গল্পও হওয়া উচিত সেই অনুসারী। এছাড়া ‘চরিত্র’ সম্পর্কে প্রথম সংকলনে শেখর বসু ‘চরিত্র প্রসঙ্গে’ শীর্ষক নিবন্ধে বলেছিলেন,

> আমরা চরিত্র সৃষ্টিতে কোনরকম ভাড়া-করা পরিকল্পনা মানি না। পাঠকের কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বিস্তারের কাজে চরিত্রকে খাটাতে চাই না। 'শ্রেণীহীন' চরিত্রে বিশ্বাস করি। ট্রাজিক, কমিক, টাইপ ইত্যাদি শ্রেণীনির্দেশক বিশেষণগুলো হাস্যকর। আমরা চাই না চরিত্র গল্প-উপন্যাসের কিংবা গল্প-উপন্যাস চরিত্রের দাসত্ব করুক।[৩৭]

আবার ভাষারীতির ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা কোনো ছুঁৎমার্গে বিশ্বাসী ছিলেন না। আটপৌরে শব্দকে সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁরা। তাঁদের মনে হয়েছিল, শিল্প সৃষ্টির অন্যতম উপাদান যে ভাষা তা প্রায়ই অযথার্থ ও সংকীর্ণ; এবং তা তাঁদের মিশ্র অস্পষ্ট অনুভব প্রকাশে অক্ষম।

লেখকগোষ্ঠী : 'এই দশক'- পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৬৬) মোট পাঁচ জন গল্পকারের গল্প দিয়ে শাস্ত্রবিরোধিতার সূত্রপাত ঘটেছিল। এই পাঁচ জন হলেন –

১।সুব্রত সেনগুপ্ত
২। রমানাথ রায়
৩। শেখর বসু
৪। কল্যাণ সেন
৫। আশিস ঘোষ

পরবর্তীকালে আরও তিন জন এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁরা হলেন –

৬। অমল চন্দ
৭। বলরাম বসাক
৮। সুনীল জানা

'এই দশক'-এর পাতায় তাঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল যথাক্রমে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও অষ্টম সংখ্যায়। শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল মূলত এই আট জন গল্পকারকে নিয়েই। এছাড়া আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও, শাস্ত্রবিরোধীদের মানসিকতার কাছাকাছি – এমন বেশ কিছু গল্পকারদের গল্প ছাপা হয়েছিল 'এই দশক' পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন –

৯। অশোককুমার দাস
১০। মনোমোহন বিশ্বাস
১১। সমর মিত্র
১২। কুমারেশ নিয়োগী
১৩। প্রিয়ব্রত বসাক

১৪। দেবশ্রী দাস
১৫। তপনলাল ধর
১৬। সুকুমার ঘোষ
১৭। মোহিত চক্রবর্তী
১৮। অরুণেশ ঘোষ
১৯। রথীন ভৌমিক
২০। উদয় ভট্টাচার্য
২১। দেবীপদ মুখোপাধ্যায়
২২। অতীন্দ্রিয় পাঠক। প্রমুখ।

যাঁদের হাত ধরে শাস্ত্রবিরোধিতার সূত্রপাত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান এক কাণ্ডারী শেখর বসুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে এই আলোচনার ইতি টানা যাক। কথাসাহিত্যিক শেখর বসু ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন তিনি। কর্মজীবনের সূত্রপাত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে। পরবর্তীকালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, আনন্দমেলা এবং প্রবাসী আনন্দবাজার-এর সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সময়ে। তাঁর প্রথম বই 'দশটি গল্প' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে, সেসময়ে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন তিন বছরে পা দিয়েছে। এই 'দশটি গল্প' গ্রন্থের দশটি গল্পই প্রকাশিত হয়েছিল ছোট পত্রিকায়। ১৯৭০ সাল থেকে তিনি বড় পত্রিকাতেও লেখা শুরু করেন। 'দেশ' পত্রিকায় ওই বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর 'টাঙ্গি' গল্পটি, যা তাঁকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। প্রকাশের অব্যবহিত পরেই 'নতুন স্রোত বাংলা গল্প' অভিধায় গল্পটির হিন্দি অনুবাদ বেরোয় নয়া দিল্লি প্রকাশন সংস্থার 'আজকাল'-এ। ১৯৭২ সালে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার'-এ প্রকাশিত হয় 'নীল আলোয়' গল্পটি, যেটি পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত নির্বাচিত গল্পসংকলন 'আনন্দসঙ্গী'তে স্থান পেয়েছে। দেশ ও আনন্দবাজারে প্রকাশিত তাঁর গল্পের সংখ্যা শতাধিক। 'দশটি গল্প' ছাড়াও তাঁর আরও অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলি হল 'মাঝখান থেকে' (১৯৮১), 'পরম্পরা' (১৯৮৯), 'মায়ানগরের রাত' (১৯৯২), 'ভালোবাসা' (১৯৯৪), শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৯৮), 'পঞ্চাশটি গল্প' (২০১১) ইত্যাদি। নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর অনেক গল্প। গল্প ছাড়াও আছে উপন্যাস, প্রবন্ধ, কিশোর সাহিত্য, অনুবাদ-গ্রন্থ। সম্পাদনা করেছেন 'শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প' ও 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প' সংকলন। সুভাষচন্দ্র বসুর স্ত্রী এমিলি শেঙ্কেলের সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রচনা করেছেন 'নেতাজীর সহধর্মিণী', যা এমিলির প্রথম জীবনীগ্রন্থ হিসেবে গৃহীত।

এছাড়াও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকালে 'এই দশক' পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি শাস্ত্রবিরোধীদের অন্যান্য গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন - সুব্রত সেনগুপ্তের 'জামা', 'সত্য ও সত্য'; রমানাথ রায়ের 'ক্ষত ও অন্যান্য গল্প', 'বলার আছে'; কল্যাণ সেনের 'পরিত্যক্ত পান্থশালা ও তারা চারজন'; আশিস ঘোষের 'সময়', 'আমি কেন আমি'; অমল চন্দের 'বারান্দা', 'শান্ত পড়ে যাচ্ছে'; বলরাম বসাকের 'কার্পেট', 'প্রিয় জিনিস'; সুনীল জানার 'সাক্ষাৎকার ইত্যাদি গল্প' ইত্যাদি। এই লেখকদের কিছু উপন্যাসও এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছে, যেমন – অমল চন্দের 'অভিযোগ', শেখর বসুর 'অন্যরকম', রমানাথ রায়ের 'ছবির সঙ্গে দেখা', 'তোমার জন্যে'। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে সুনীল জানার নাটকের বই 'শেষ দুর্ঘটনা'। ছোটদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে বলরাম বসাকের 'পিঁপড়ে হাতি', সুনীল জানার 'অপরূপ কথামালা', শেখর বসুর 'সোনার বিস্কুট'। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে অমল চন্দের প্রবন্ধগ্রন্থ 'ছাঁচ ভেঙে ফেল' ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র

১। উত্তম দাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা – ৭৪৩৩০২ : মহাদিগন্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২০-২১।

২। সন্দীপ দত্ত, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৩-৪।

৩। উত্তম দাস, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ১৪।

৪। শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন, কলকাতা-৭৩ : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮।

৫। উত্তম দাস, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ১০।

৬। তদেব, পৃ. ১৪।

৭। তদেব, পৃ. ৪৬।

৮। শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৮।

৯। শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৪৫।

১০। তদেব, পৃ. ৭-৮।

১১। 'এই দশক' পত্রিকা, অষ্টম সংকলন, ৬ সাহাপুর মেইন রোড, কলকাতা-৩৮, পৌষ ১৩৭৫, পৃ. ৪৩।

১২। শ্রুতি পত্রিকা, প্রথম সংকলন, ৬৮/৪ সি পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-২৯, পৃ. ১।

১৩। শ্রুতি পত্রিকা, দশম সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, মার্চ ১৯৬৯, পৃ. ১।

১৪। শ্রুতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৬৮/৪ সি পূর্ণদাস রোড, কলকাতা- ২৯, সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

১৫। শ্রুতি পত্রিকা, পঞ্চম সংকলন, ৪২-গড়পার রোড, কলকাতা-০৯, জুলাই ১৯৬৬, পৃ. ১৮।

১৬। শ্রুতি পত্রিকা, সপ্তম সংকলন, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, জানুয়ারি ১৯৬৮, পৃ. ১।

১৭। শ্রুতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৬৮/৪ সি পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-২৯, পৃ. ২৪।

১৮। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত দশম সংকলন, পৃ. ২-৩।

১৯। শ্রুতি পত্রিকা, চতুর্দশ সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, আগস্ট ১৯৭১, পৃ. ১।

২০। অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধ, 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, শ্রুতি বিশেষ সংখ্যা, দঃ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ. ৪৭।

২১। তদেব, পৃ. ৪৮।

২২। শ্রুতি পত্রিকা, নবম সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, জুলাই ১৯৬৮, পৃ. ৩২।

২৩। উত্তম দাস, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৬২।

২৪। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত সপ্তম সংকলন, পৃ. ১।

২৫। ঐ।

২৬। অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধ, 'পদ্যপত্র' পত্রিকা, অর্পণ পাল সম্পাদিত, শ্রুতি বিশেষ সংখ্যা, দঃ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ. ৪৫।

২৭। উত্তম দাস, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ১০১।

২৮। ঐ।

২৯। শেখর বসু সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী গল্প, কলকাতা-৭৩ : এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৪।

৩০। অতীন্দ্রিয় পাঠক, 'অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধ, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৪১০।

৩১। উত্তম দাস, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৯৭।

৩২। রবিন পাল, 'শেখর বসুর শাস্ত্রবিরোধী গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৩৮৯।

৩৩। Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn, UK : Charles L. Webster and Company, 1884, Global Grey ebooks, p. 1.

৩৪। রমানাথ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধীতা : ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধীতা' শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন, ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার সম্পাদিত, কলকাতা-১১৮ : ইসক্রা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১৪, পৃ. ১৭।

৩৫। রমানাথ রায়, সম্পাদকীয় নিবন্ধ, 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য', দ্বিতীয় সংকলন, কলকাতা-৩৮, মাঘ ১৩৮১, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত।

৩৬। রমানাথ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধীতা : ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধীতা' শীর্ষক প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত 'বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন', পৃ. ৭।

৩৭। শেখর বসু, 'চরিত্র প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ, 'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য', প্রথম সংকলন, অমল চন্দ ও অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩এ গড়পাড় রোড, কলকাতা-০৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ২।